মাসুদ রানা

নাটের গুরু

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী



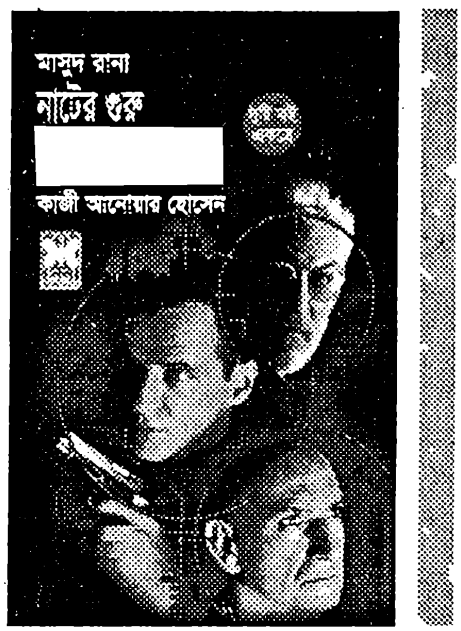


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

নাটের গুরু

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7672-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৯

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স. ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
NAATER GURU
ASHCHEY CYCLONE
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চুয়ান্ন টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬২/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৫৪/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৫২/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৮৪/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৭১/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৫১/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৬৯/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-

১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭	অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১	কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭	শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩	গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪	জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০	দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪	বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯	মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭	চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১	মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬	আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২	অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮	অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১	কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭	স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০	শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১	ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫	মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮	গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩	অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩	আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬	সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯	কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-
৩৫০-৩৫৬	বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯	বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১	শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮	হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭	কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬৫-৩৬৬	নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯	গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬	ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৭/-
৩৭৩-৩৭৪	দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭	সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯	স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৩৮২-৩৮৩	মৃত্যুশীতল স্পর্শ ১,২ (একত্রে)	৭৫/-

নাটের গুরু

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

এক

এমআই ফাইভ-এর জন লেইটার অনেকদিন থেকে এসপিয়োনাজ জগতে আছেন, কাজেই বুঝতে তাঁর দেরি হলো না, পিছনে ফেউ লেগেছে।

রাতটা বৃষ্টিভেজা, খানিকটা কুয়াশাও আছে, এরকম রাতে সাধারণত মানুষ ঘরে থাকতে চায়। অথচ এক লোক গত বিশ মিনিট ধরে তাঁর পিছু নিয়ে আসছে। পুরো একটা ব্লক পিছিয়ে থাকছে সে, দূরত্ব বাড়ছেও না, কমছেও না। লেইটার যে-পথে বাঁক নিন, সে আছেই।

লন্ডনের সিক্ত রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে।

রেইনকোটের তলায় কোমরে গুঁজে রাখা প্লাস্টিকের থলেটা একবার স্পর্শ করলেন লেইটার। ওটাতে করেই চাইনিজ ডিফেন্সের ওপর একটা গোপন রিপোর্ট নিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি দু'ঘণ্টা আগে। নির্দেশ মতো নির্ধারিত জায়গায় থলেটা পৌঁছে দিতে হবে। ঠিকানাটা কাছেই বলে গাড়ি নেননি তিনি, ভেবেছেন মাইলখানেক হাঁটলে হজমটা ভাল হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সিদ্ধান্তটা ভুলও হতে পারে। মরা মানুষ কিছু খায় না, তার হজমের দরকার হয় না, নিজেই সে তখন পোকামাকড়ের খাবার।

এবার কৌশলী হওয়ার সময় হয়েছে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন লেইটার। পিছনের লোকটা যদি দক্ষ হয়, তা হলে তাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হওয়া যাবে লোকটা আসলেই ফেউ। ফেউ যদি হয়, মুখ খোলানোর পর প্রয়োজনে লোকটাকে খতম করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বড় রাস্তায় উঠে এলেন জন লেইটার। সাপারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায়, তবে এখনও, এই বিশ্রী আবহাওয়াতেও এ-রাস্তায় অনেক দোকানপাট খোলা। কয়েকটা দোকান বেছে নিলেন লেইটার ওগুলোর আকার দেখে। যেগুলোয় একটার বেশি ঢোকার এবং বেরুবার পথ আছে।

প্রতিটা দোকানে ঢুকলেন লেইটার, স্বল্পসংখ্যক খদ্দেরদের মাঝে মিশে যেতে চেষ্টা করলেন। একই সঙ্গে খুঁজে নিচ্ছেন বেরিয়ে যাবার আরেকটা পথ।

মোট চারবার কাজটা করলেন তিনি। তারপরও পিছনের লোকটা ঠিকই আছে। খসানো গেল না।

তার মানে লোকটা সত্যি ফেউ। দক্ষ এবং পেশাদার।

এবার তা হলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। নীরব এবং নির্জন কোথাও লোকটাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে; এমন কোথাও, যেখানে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই লোকটার মুখ খোলানো যায়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

লন্ডন শহরটা নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন লেইটার, জানেন ঠিক কোথায় নির্জনতা পাওয়া যাবে। কয়েকবার বাঁক নিলেন তিনি, তারপর পৌঁছে

গেলেন হোটেল হিলটনের পিছনের সরু, অন্ধকার গলিটার সামনে। ঘুরে গিয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠেছে গলিটা, তবে খুব কমই ব্যবহার করা হয়। গটগট করে জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছেন লেইটার। একবারও কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়লেন তিনি গলিতে।

এবার সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। এতোই সরু গলি যে সতর্ক না থাকলে দু'পাশের দেয়ালে ঘষা খাবে তাঁর চওড়া কাঁধ। নিঃশব্দে এগোলেন লেইটার, দুটো বাঁক ঘুরলেই হোটেলের পিছন ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পৌঁছে যেতে পারবেন। কিন্তু প্রথম বাঁক ঘুরেই থেমে পড়লেন তিনি। এখানে গলিটা একটু চওড়া। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ছায়ায় মিশে অপেক্ষায় থাকলেন তিনি। আস্তে আস্তে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। পিছনের লোকটা মস্ত বোকামি করবে তাঁকে অনুসরণ করে গলিতে ঢুকলে। তৃপ্তির সঙ্গে ভাবলেন, কিন্তু গলিতে না ঢুকে ব্যাটার আর কোনও উপায়ও নেই।

পায়ের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া রেখেছেন লেইটার। এক হাতে বেরিয়ে এসেছে ব্রাউনিং ·৩৮ পিস্তলটা। এটা তিনি অনেক বছর ধরে ব্যবহার করছেন। আরেক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছেন থলেটা।

দীর্ঘদিন এসপিয়োনাজ জগতে থাকার কারণে ফিল্ডে খুব কম ভুলই করেন জন লেইটার, আর করলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে ফেলেন। সামনে থেকে পায়ের আওয়াজ এলো না, কিন্তু পিছন থেকে খসখস একটা শব্দ শুনতে পেয়েই বুঝে ফেললেন তিনি কোথায় ভুল হয়েছে। ঘুরে দাঁড়াবার সময় পেলেন না, তাঁর ভেজা চুল মুঠোয় নিয়ে হ্যাঁচকা টান দেয়া হলো। মাথাটা ঝটকা খেয়ে পেছনে হেলে পড়তেই উন্মুক্ত হয়ে গেল গলাটা।

তীক্ষ্ণধার ফলা তাঁর চামড়া কেটে জাগিউলার ভেইনে বসে যেতেই চট্ করে লেইটার বুঝতে পারলেন ভুলটা শোধরাবার আর কোনও উপায় নেই। পিছনে লেগে থাকা ফেউ-এর অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সামনেও যে কেউ থাকতে পারে এই সন্দেহটা তাঁর মনে একবারও জাগেনি। আসলে একাধিক ফেউ তাঁকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখেছিল।

হিলটনের চিফ শেফ হার্ভি রনসন মাসুদ রানার পরিচিত। বছর পাঁচেক আগে হার্ভিকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়, তখন রানা লন্ডনেই ছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যেত ওর। লন্ডন পুলিশ নিশ্চিত ছিল যে হার্ভিই প্রতিহিংসার বশে তার বান্ধবীকে খুন করেছে। হার্ভির মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেসটা হাতে নেয় রানা, তদন্তে বেরিয়ে আসে আসলে হার্ভি নয়, মেয়েটাকে খুন করেছিল হার্ভির ফ্ল্যাট মেট। খুনের আলামত তো খুঁজে বের করেছিলই, লোকটার অ্যালিবাই যে মিথ্যে তারও অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে হাজির করেছিল কোর্টে। ফলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায় লোকটার, সসম্মানে মুক্তি পায় হার্ভি। সেই থেকে হিলটনে উঠলে একবার হলেও ওকে হার্ভি রনসনের সঙ্গে বসে বিশেষ যত্নে তৈরি আট-দশ কোর্সের সাপার খেতে হয়। আজ সকালেই হার্ভি ওকে দাওয়াত

দিয়েছে তার পর থেকে মনে করিয়ে দিয়েছে অন্তত ছয় বার। সম্পর্কটা এতো আন্তরিক যে এই বিশেষ সাপারটা ওরা খায় হোটেলের কিচেন-টেবিলে বসে। আজও তা-ই খেয়েছে রানা। হার্ভির রান্না অসাধারণ, আর কোনওকিছু কম খেলে মুখ গোমড়া করে, কাজেই গলা পর্যন্ত ঠেসেছে রানা মাঞ্চুরিয়ান ফুল কোর্স। প্রায় আস্ত একটা বড়সড় রোস্ট করা হাঁস শেষ করতে হয়েছে ওকে। এরপর কিছুক্ষণ গল্প করে উঠে পড়েছে ও, হার্ভিকে বলেছে খানিক হেঁটে না এলে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে। একগাল হেসেছে হার্ভি, বলেছে, 'মিস্টার রানা, সায়ারি, আপনি মারা গেলে আমার রান্নার এতো এতো প্রশংসা না পেয়ে হতাশ হয়ে মারা যাব আমিও।'

গায়ে রেইনকোট চাপিয়ে কিচেনের দরজা দিয়ে হিলটনের পিছনের সরু গলিটায় বেরিয়ে এসেছে রানা, বড় রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছে। গুনগুন করে বেসুরো গান ভাঁজছে ও, আর মনে মনে পরিকল্পনা করছে ছুটির দিনগুলোতে কী করা যায়। ঠিক তখনই গা গুলানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা শুনতে পেল ও, যেন এইমাত্র এখানে গরু জবাই করা হয়েছে।

ব্যাপারটা কী দেখার জন্য হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে গেল ওর। অন্ধকার সয়ে আসছে চোখে। গলির মেঝেতে পড়ে থাকা কালো স্তূপটা সতর্ক করে তুলল ওকে। যতই বেঢপ হোক, দেখেই বোঝা যায়–মানুষ।

সাবধানে এগোল রানা। ইতিমধ্যে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা। বুঝতে পারছে কারও গলা কাটা হয়েছে গলির ভিতর। খুনি এখনও কাছেই আছে, কারণ মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার ঘড়ঘড়ানি এখনও থামেনি।

গলিটা সরু বলে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেউ যদি গুলি করে তা হলে বুলেট সরাসরি আঘাত না করলেও দেয়ালে লেগে পিছলে এসে বিঁধতে পারে। কথাটা কতখানি সত্যি সেটা এক মুহূর্ত পরেই টের পেল রানা।

গলির মেঝেতে কালো স্তূপের মত পড়ে থাকা লোকটার সাহায্য দরকার। তার পাশে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারে চোখ বুলাল রানা, পালস দেখবার জন্য হাঁটু গেড়ে নিচু হতে শুরু করেছে, এই সময় বগলের কাছে ফুটো হয়ে গেল রেইনকোট। হ্যাঁচকা একটা টান শুধু অনুভব করল ও। কড়াৎ আওয়াজটা হলো আধসেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ পর।

আওয়াজ লক্ষ্য করে করা গুলি, লাগল না।

তবে একা শুধু রানা নয়, এক সেকেন্ড পর আরও কেউ গুলি করল। ওর সন্দেহ হলো, দুজনের টার্গেট বোধহয় একই।

রানার নয়, দ্বিতীয় কারও গুলি খেয়ে কাতরে উঠল এক লোক। ছুটে পালাচ্ছিল সে, হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল পদক্ষেপগুলো, তারপর একেবারে থেমে গেল। সেই-ই বোধহয়, ভারী বস্তার মত শব্দ করে পড়েও গেল।

তারপর কারও দৌড়ানোর আওয়াজ পেল রানা। পাঁচ সেকেন্ড পেরোনোর আগেই গলি থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

রানা পিছু নিল পদশব্দের। কিন্তু আট-দশ পা এগিয়েই বুঝতে পারল, যে-

লোকটা পালাচ্ছে সে ওর রেইনকোট ফুটো করেনি। ফুটোর জন্য যে দায়ী সে এখন কাত হয়ে নিথর পড়ে আছে গলির মধ্যে। লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা।

যেই গুলি করে থাকুক, অব্যর্থ লক্ষ্য তার, কপালের ঠিক মাঝখানে ঢুকেছে বুলেটটা। পাল্‌স্‌ দেখল–নেই। দেরি না করে তাকে রেখে আবার গলির ভিতর দিকে এগোল ও। কালো স্তূপের মত পড়ে থাকা লোকটা এখন আর কোনও আওয়াজ না করলেও, কী অবস্থায় আছে দেখা দরকার।

গলিতে কোথাও কোনও শব্দ নেই। লোকটার পাশে একটা হাঁটু গেড়ে নীচু হলো রানা, হাত বাড়িয়ে লোকটার কবজি ধরল। পাল্‌স্‌ পেল না। উন্মুক্ত হয়ে আছে গলাটা, আবছা অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ধারাল কিছু দিয়ে জবাই করা হয়েছে তাকে। মাথাটা পিছনদিকে বাঁকানো, তাই মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আরও একটু ঝুঁকল রানা, লোকটার মাথার পিছনে হাত রেখে নিজের দিকে টানল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। খোদা, না! এ হতে পারে না! এক সেকেন্ড পরেই উপলব্ধি করল রানা, অসম্ভব মনে হলেও, চোখের সামনে এটা রূঢ় বাস্তবতা মাত্র। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, সত্যি বলে মেনে নিতে হবে। বুকের ভিতর তীব্র একটা মোচড় অনুভব করল ও। ওর গোটা অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথাটা।

জন লেইটারের বিস্ফারিত চোখ দুটো বন্ধ করে দিল রানা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধে হলো। এই যে অতি সামান্য তিক্ত হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে, এটার যেমন কারণ আছে, তেমনি এই মুহূর্তে যে অভিমানটা হচ্ছে ওর, সেটাকেও অকারণ বলা যাবে না।

গলি থেকে বেরুবার জন্য নিঃশব্দ পায়ে, সাবধানে হাঁটছে রানা। ভাবছে, হিলটনের পিছন থেকে ও যদি দু'মিনিট আগে বেরুত, জন লেইটার হয়তো বেঁচে থাকতেন এখনও। নিয়তির খামখেয়ালির প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্রূপের প্রকাশ ওর ওই তিক্ত হাসি।

আর অভিমানটা জন লেইটারের প্রতি, শেষ পর্যন্ত ঋণ শোধ করবার কোনও সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন ভদ্রলোক।

হতাশ ও বিধ্বস্ত বোধ করছে রানা, তারপরও দ্রুত হাঁটবার চেষ্টা করছে ও–মেইন রোডে বেরিয়ে পে বুদ থেকে টেলিফোন করে পুলিশে খবর দিতে হবে ওকে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সজ্জন ব্যক্তি এমআই ফাইভ-এ দ্বিতীয় আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। শান্ত গাম্ভীর্য দৃঢ় একটা বর্মের মত আড়াল করে রাখত তাঁকে, খুব কম মানুষই সেটা ভেদ করে তাঁর উষ্ণ হৃদয়ের সান্নিধ্য পেয়েছে। রানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুর মত ছিল না, আবার ওদেরকে গুরু-শিষ্যও বলা যাবে না। অনেকটা দুই জহুরী যেমন দেখামাত্র পরস্পরকে চিনতে পারে, অন্তত ওদের পরিচয়পর্বটা সেরকমই ছিল।

নব্বইয়ের দশকে একটানা সাত-আট বছর ঢাকার ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি

করেছেন জন লেইটার, তখনই বাংলাদেশ ও বাঙালী সংস্কৃতিকে ভালবেসে ফেলেন। সেই থেকে বিপদে-আপদে সব সময় বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

এক এক করে অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসছে রানার মনের পরদায়। সৎ পরামর্শ দিয়ে, না চাইতেই কত ধরনের ব্যক্তিগত উপকার করে, জন লেইটার রীতিমত ঋণী ও কৃতজ্ঞ করে তুলেছিলেন ওকে। এই যে আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বড় শহরে রানা এজেন্সিকে দেখা যাচ্ছে, প্রায় অসম্ভব এই কাজটাকে সম্ভব করে তোলার ব্যাপারে তাঁরও বেশ খানিকটা অবদান ছিল।

অথচ এমন একজন আশ্চর্য মানুষ, যখনই কোনও প্রতিদান দিতে গেছে রানা, অমায়িক হেসে ফিরিয়ে দিয়েছেন ওকে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন–বাঙালী আর বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা আছে, তাই মনের টান থেকে সাহায্য করেন, বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশায় নয়।

গলির শেষ মাথার কাছাকাছি এসে আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা, হাঁটার গতি গেছে কমে, হাতের পিস্তলও রেডি।

মিনিট খানেক পর বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দু'তিনজনের চিৎকার শুনতে পেয়ে থমকে গেল ও।

'হল্ট!'

আস্তে করে পিস্তলসহ দু'হাত মাথার ওপর তুলল রানা। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল গলির দু'পাশে দুজন দুজন করে চারজন পুলিশ অফিসার তাদের রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা বোধহয় টহলে ছিল, গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে পুলিশ-কার নিয়ে হাজির হয়ে গেছে–সাইরেন না বাজিয়েই।

'পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে দাও!'

নির্দেশ পালন করল রানা, শুকনো গলায় বলল, 'গলির মধ্যে এমআই ফাইভের একজন অফিসারকে খুন করা হয়েছে। খুনি আমাকেও গুলি করেছিল, পাল্টা গুলি করে আমি লাগাতে পারিনি। তবে আরেকজনের গুলিতে সে-ও মারা গেছে। তার সঙ্গে কজন ছিল জানি না, পালিয়েছে তারা। সঙ্গীদের কেউই মারল, নাকি অন্য কেউ, বলতে পারব না।'

গলি থেকে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার বের হয়ে রানার পিছনে দাঁড়াল। গলির ওদিক থেকে এসেছে তারা। একজন বলল, 'এই লোক গলির ভেতর দু'জনকে খুন করেছে। একজনকে জবাই করে, আরেকজনকে গুলি করে।'

'না,' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমি গলিতে বেরুবার আগেই এমআই ফাইভের অফিসারকে জবাই করা হয়েছে। খুনি আমাকে গুলি করায় আমি পাল্টা গুলি করেছি, তবে লাগাতে পারিনি। বললাম না, অন্য কারও গুলি খেয়ে মারা গেছে লোকটা।'

ব্রিটিশ পুলিশ বাতচিত একটু কমই করে। একটা কথাও না বলে হাত পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো রানাকে, সার্চ করে বের করে নেয়া হলো ওর স্টিলেটো, তারপর কয়েক ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়া হলো একটা পুলিশ

কারের পিছনে। একজন অফিসার গ্লাভ্‌স্ পরা হাতে সাবধানে রানার ওয়ালথারটা তুলে একটা স্বচ্ছ পলিথিনের ব্যাগে ভরল। ততক্ষণে জ্বলজ্বলে লাল বাতি মাথায় নিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে। আর কিছু দেখার সুযোগ পেল না রানা, ওকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পুলিশের গাড়ি। পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে একটা টেলিফোন করতে চাইল রানা। ওকে বলা হলো ক্যাপ্টেন আসার আগে কোনও ফোন নয়, অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

জানালাবিহীন ছোট একটা ঘরে রানাকে ঢুকিয়ে নিরেট স্টিলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা খটখটে কাঠের চেয়ার আর স্টিলের একটা টেবিল। নগ্ন একটা বাল্‌ব্ জ্বলছে মাথার ওপর। চেয়ারে বসল রানা, বুঝতে পারছে ওকে দেরি করিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে রাখতে চাইছে পুলিশ।

আড়াই ঘণ্টা পর খুলে গেল স্টিলের দরজা, ভেতরে ঢুকলেন বয়স্ক একজন পুলিশ অফিসার। তাঁর কাঁধের ইনসিগনিয়া দেখে বোঝা গেল ক্যাপ্টেন তিনি। পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'একটা ফোন করতে চাই আমি,' ক্যাপ্টেন ঢুকতেই বলল রানা।

'পরে,' কঠোর চেহারায় রানাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'তার আগে আপনার সঙ্গে কথা আছে।' টেবিলের ওপর বসলেন তিনি। 'দু'জন মানুষকে খুন করেছেন আপনি। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমাদের শুধু এটুকু জানিয়েছে, একজন এমআই ফাইভের অফিসার জন লেইটার, আরেকজন বিএসএস-এর এজেন্ট রেমন হিউবার্ট। গলা কেটে মেরেছেন জন লেইটারকে। একটু আগে কেসটা আমাদের এক্তিয়ার থেকে নিয়ে নিয়েছে বিএসএস। তার আগেই অবশ্য আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে লাইসেন্স আছে আপনার, ক্ষমতাধর কারও কারও সঙ্গে দহরম-মহরমও আছে, কয়েকবারই নাকি পুলিশের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছেন ক্লিন। কিন্তু এবার কারও সাহায্য আপনার কোনও কাজে আসবে না। স্পষ্ট জানি, কেউ কথা বলবে না আপনার পক্ষে।' রানার প্রতিক্রিয়া দেখতে থামলেন ক্যাপ্টেন, তারপর বললেন, 'খুনের ব্যাপারে কী বলার আছে আপনার? স্বীকারোক্তি দেবেন?'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল রানা। এমআই ফাইভের অফিসার জন লেইটারের গলা কেটেছে বিএসএস-এর রেমন হিউবার্ট! কিন্তু কেন? চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ও বলল, 'আমি কাউকে খুন করিনি, কাজেই স্বীকারোক্তি দেবার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া কেসটা এখন আপনাদের হাতেও নেই। যারা কেসের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'খুন করেননি বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে পারবেন?'

'প্রমাণ করতে হবে না আমাকে,' বলল বিরক্ত এবং চিন্তিত রানা। 'আপনি শুধু আমার দেয়া একটা নম্বরে ফোন করুন।'

চোখ সরু করে রানাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'ভাবছেন আপনাদের দূতাবাস

হস্তক্ষেপ করবে? ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবেন? সে-সুযোগ এদেশের কর্তৃপক্ষ দেবে না আপনাকে।'

'আপনাদের বিএসএস চিফের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' বলল রানা। ক্যাপ্টেন ভ্রূ উঁচু করলেন। 'নম্বরটা লিখে নিন।' ক্যাপ্টেন বিরক্ত চেহারায় নোটবুক বের করায় মুখস্থ বলে গেল রানা মার্ভিন লংফেলোর বাড়ির গোপন টেলিফোন নম্বর। এই নম্বর জানে শুধু মার্ভিন লংফেলোর ঘনিষ্ঠ জনেরাই।

পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন ক্যাপ্টেন, নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করলেন, তারপর ফোনটা ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

মার্ভিন লংফেলো সাড়া দিতেই নিজের পরিচয় জানাল রানা। দুঃখ প্রকাশ করল এই অসময়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে, তারপর সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল।

চুপচাপ শুনলেন লংফেলো, তারপর বললেন, 'এই মাত্র খানিকটা শুনেছি আমি, অফিস থেকে ওরা ফোন করেছিল। রিসিভারটা ক্যাপ্টেনকে দাও, রানা।'

রানা মোবাইল বাড়িয়ে দিতেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেটা নিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যে ভদ্রলোকের চেহারা পাল্টে গেল। কথা শোনার ফাঁকে বারবার রানার দিকে তাকাচ্ছেন এখন। তারপর মুখটা লালচে হতে শুরু করল। 'জী। জী। জী, বুঝেছি। না, বিএসএস কেসটা নিজেদের হাতে নেয়ায় মিস্টার রানার বিরুদ্ধে ফর্মাল কোনও অভিযোগ আনা হয়নি। না, না, কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক আছে। জী। অবশ্যই! তাঁকে এসকর্ট করে পৌঁছে দেয়া হবে। জী। আমাদের গাড়িতে। জী।' ফোন রেখে রানার দিকে তাকালেন তিনি সমীহের সঙ্গে, আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'আপনি যেতে পারেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার অসুবিধের জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমার স্টিলেটো আর পিস্তলটা ফেরত দিচ্ছেন তো?'

'অবশ্যই! এক্ষুনি পেয়ে যাবেন। আসুন আমার সঙ্গে। পুলিশের গাড়ি আপনাকে এসকর্ট করে মিস্টার লংফেলোর বাড়িতে পৌঁছে দেবে।'

মার্ভিন লংফেলোর প্রাসাদোপম বাড়িটা শহরের প্রান্তে, অভিজাত এলাকায়। লিভিংরুমে রানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

বাটলারের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে ভূত দেখবার মত চমকে উঠল রানা, নিজের অজান্তেই শ্লথ হয়ে গেল এগোবার গতি। ওকে দেখে সোফা ছাড়ছেন এক ভদ্রলোক... কে তিনি? ধীরে ধীরে মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছে রানা, তিন সেকেন্ড পর মনে হলো ইনিই বোধহয় মার্ভিন লংফেলো, তবে চিনতে এখনও কষ্ট হচ্ছে তাঁকে ওর। আশ্চর্য, মানুষের চেহারা এতটা বদলায় কীভাবে?

রানা শুধু উদ্বিগ্ন নয়, মনে মনে বিচলিত বোধ করছে। মারভিন লংফেলো ওর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। মনটা আগাম গাইল ওর, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অসুস্থ; খুব খারাপ কিছু হয়েছে তাঁর।

সোফা ছেড়ে এগিয়ে আসছেন মার্ভিন লংফেলো নন, যেন তাঁর প্রেতাত্মা। হ্যান্ডশেক করার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'হ্যালো, মাই বয়? কেমন আছ তুমি? এই একটু আগে রিপোর্ট পেলাম হিলটনের পেছনে কী ঘটেছে। ওরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'না, কেউ কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি,' বলল রানা, ধরার পর তাঁর হাতটা ছাড়ছে না। 'আশ্চর্য, কেউ আমাকে বলেনি যে আপনি অসুস্থ! কী হয়েছে আপনার, মিস্টার লংফেলো?'

ম্লান একটু হেসে মাথা নাড়লেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। ইঙ্গিতে বাটলারকে বিদায় করে দিয়ে বললেন, 'আমি ঠিক আছি, রানা। কিছুই হয়নি আমার।'

'কিছু হয়নি? ঠিক আছেন?' রানার ভুরু কপালে উঠে যাচ্ছে। 'ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, সার। খুব খারাপ লাগছে। কিছু একটা গোপন করছেন আপনি আমার কাছে—কী সেটা, প্লিজ?'

'ঠিক আছে,' স্বীকারোক্তি দেওয়ার সুরে বললেন বিএসএস চিফ, 'হ্যাঁ, সত্যিই কিছু একটা গোপন করছি আমি।' পরিশ্রান্ত, অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। 'কারণ সেটা মানুষকে বলে বেড়ানোর মত কোনও ব্যাপার নয়।'

'আমাকেও বলা যায় না?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'তা হয়তো যায়,' খানিক ইতস্তত করে বললেন লংফেলো। 'কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। তুমিও আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'মানে?' যেন অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল রানার। 'আপনাকে বাঁচাতে পারব না? কেন, কী হয়েছে আপনার?'

'হয়নি, হবে,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লংফেলো। 'রানা, খুব বিশ্রী শোনাবে কথাটা, তবে তোমাকে বলা যায়। আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হতে পারে।'

এরকম কিছু শোনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রানা। দু'সেকেন্ডের জন্য ভাষা হারিয়ে তাকিয়ে থাকল ওর বস্-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে। তবে দ্রুত কাজ চলছে মাথার ভিতর। ভদ্রলোক শারীরিক কোনও সমস্যায় ভুগছেন না। ব্যাপারটা তা হলে মানসিক। মানুষের গোপন কত পাপ থাকে, কেউ কেউ আবার কোনও পাপ না করেও অপরাধ বোধে ভোগে। সেরকম ব্যক্তিগত কিছু নাকি? সেক্ষেত্রে বেশি আগ্রহ দেখানোটা উচিত হবে না।

'কী বলছেন! কেন?' দুই সেকেন্ড পর জানতে চাইল রানা।

'সে অনেক কথা,' ইঙ্গিতে একটা সোফা সেট দেখালেন লংফেলো। রানাকে বসিয়ে নিজেও বসলেন। 'আমি তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'মার্ভিন লংফেলোকে আত্মহত্যা করতে হতে পারে, তার কারণ জানাটা আমার সময়ের অপচয়, এ আপনি ভাবতে পারলেন?' শুধু বিস্মিত নয়, সেই সঙ্গে একটু বোধহয় আহতও বোধ করছে রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন বিএসএস চিফ, রীতিমত অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। 'তোমার

হাতে জরুরি কোনও কাজ নেই তো?'

'আমি ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছি, হাতে অঢেল সময়,' বলল রানা। 'সব কথা খুলে বলুন, সার, আমাকে। অনেক সময় সামান্য ইঁদুরও সাহায্যে লাগতে পারে সিংহের—কী এমন ঘটল যে আত্মহত্যা করার কথা ভাববেন আপনি?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন লংফেলো। 'সব কথা আমার নিজেরই জানা নেই, রানা,' বললেন তিনি। 'এ এমন এক পরিস্থিতি যে যতটুকু আমার জানা আছে তারও সবটুকু তোমাকে বলতে পারব না। তবু, তুমি যখন জোর করছ, সমস্যাটা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে যতটুকু না বললেই নয়, ততটুকু বলছি।'

'আমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা,' কথাটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। 'আমাকেও সব কথা বলা যাবে না?'

'দুঃখিত, না, তোমাকেও বলা সম্ভব নয়,' বললেন লংফেলো। 'ব্যাপারটা কী নিয়ে শোনো, তা হলে বুঝতে পারবে কেন এ-কথা বলছি।'

'বেশ।' নড়েচড়ে বসল রানা।

কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে থাকলেন লংফেলো, ভাব দেখে মনে হলো শুরু করার আগে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। তারপর ধীরে-সুস্থে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে রানাকে সাধলেন। রানা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করায় নিজের গ্লাসে চুমুক দিলেন। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'আরেকবার সেই পুরোনো সমস্যায় পড়ে গেছে বিএসএস। আমাদের ভেতরেই ঢুকে পড়েছে বিশ্বাসঘাতক। তারা কতজন, আমরা জানি না। তবে ক্রেতা আছে, বিক্রি করা যাবে, এমন সব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্সের লোকদের কাছ থেকে।

'ছিনতাই করার সময় খুন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে। আজ রাতে জন লেইটারকে নিয়ে খুন হলো পাঁচজন। আগের চারজন ছিল সাধারণ কুরিয়ার। এবার চিন থেকে অত্যন্ত মূল্যবান একটা ডিফেন্স ডকুমেন্ট নিয়ে আসার জন্যে এমআই ফাইভ থেকে পাঠানো হয়েছিল একজন অফিসার, জন লেইটারকে। শুনলে অবাক হবে, রানা, ওকে খুন করেছে আমাদেরই এজেন্ট রেমন হিউবার্ট।' রানার প্রতিক্রিয়া দেখতে থামলেন লংফেলো।

রানা বলল, 'সম্ভবত রেমন হিউবার্টও খুন হয়ে গেছে। কিন্তু কার হাতে?'

'হিউবার্ট কার হাতে খুন হলো, এর চেয়ে বড় প্রশ্ন তার সঙ্গে কে বা কারা ছিল। সে মারা যাওয়ায় এ-সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না।' বড় করে শ্বাস ফেললেন লংফেলো। একটু থেমে বললেন, 'যা বলছিলাম, এজেন্টদের খুন করে তাদের কাছ থেকে তথ্য ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলো গোপন নিলামে তোলা হচ্ছে। লাখ লাখ পাউন্ড দিয়ে কিনে নিচ্ছে সেসব আগ্রহী দেশগুলো। নিলাম এতোই গোপনে হয় যে নিলাম হয়ে যাবার আগে আমরা একবারও জানতে পারিনি। আমরা খবর পেয়েছি ছিনতাই করা তথ্যগুলো দশ বিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করা হয়েছে। এ-ধরনের তথ্যের বাজারদর কীরকম চড়া বুঝতে পারছ তো, রানা? এরকমটা চলতে থাকলে আমাদের স্টেট সিক্রেট বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না

আর।

'মুশকিল হলো, অন্য সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তো বটেই, বিএসএস-এর কাউকেও এখন আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ দায়-দায়িত্ব সব এসে বর্তাচ্ছে আমার ওপর, তাই নিরুপায় হয়ে আমাকে আত্মহত্যার কথা ভাবতে হচ্ছে।'

রানা ভাবল বলে, আত্মহত্যা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। তারপর ভাবল, নাহ্, কথাটা ভদ্রলোকও জানেন। বলল, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কয়েকটা উর্বর মাথা এক হয়ে কাজটা করছে। এ-ও জানা কথা যে ভেতরের সাহায্য ছাড়া এটা একেবারেই সম্ভব নয়। কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলুন তো শুনি।'

রানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন বিএসএস চিফ।

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

অবশেষে বিএসএস চিফ বললেন, 'দুঃখিত, রানা। আগেই বলেছি, সব কথা তোমাকেও বলা যাবে না।'

তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে রানা বলল, 'দুঃখিত আমিও, মিস্টার লংফেলো।'

'মানে, রানা? ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার দুঃখের কারণ, হিলটনের পিছনের দরজা দিয়ে আমি ওই গলিতে বেরুবার এক মিনিট আগে খুন হয়ে গেছেন জন লেইটার,' বলল রানা। 'আপনি জানেন কিনা বলতে পারব না, নানা কারণে ভদ্রলোকের প্রতি ঋণী ও কৃতজ্ঞ ছিলাম আমরা। তাই ভাবছি তিনি মারা যাওয়ার পরও কীভাবে সে-ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করা যায়–'

'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ, এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, রানা। আমি ঠিক–'

বিএসএস চিফ কথাটা শেষ করতে পারছেন না দেখে রানা বলল, 'জন লেইটারকে খুন করার জন্যে যারা দায়ী আমি তাদেরকে ধরতে চাই, মিস্টার লংফেলো। একই সঙ্গে আপনার সমস্যারও সমাধান করতে চাই, আপনি যাতে আত্মহত্যার কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন।'

হাতের গ্লাসটা নিচু টেবিলে নামিয়ে রেখে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মার্ভিন লংফেলো। এগিয়ে একেবারে সামনে চলে আসায় দাঁড়াতে হলো রানাকেও। দুই হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন ভদ্রলোক। 'তুমি সাহায্য করতে চাইছ বলে নয়, রানা, কৃতজ্ঞতা বোধ করছি জন লেইটার আর আমার প্রতি তোমার ভালবাসা উপলব্ধি করে।'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন তিনি। 'এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে তোমার সাহায্য চাওয়ার সাহস হয়নি আমার। এখনও হচ্ছে না। একবার ভেবেছিলাম, আমি আমার বন্ধু রাহাত খানের কাছে হাত পাতব, বলব মাসুদ রানাকে চাই আমার। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি কেসটা কী জানার পর প্রত্যাখ্যান করবেন তিনি, এ-ও বুঝেছি তাঁর জায়গায় আমি হলেও ঠিক তাই করতাম।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। 'কাজ কাজই। আর আমাদের পেশায় কোন্ কাজটা বিপজ্জনক নয়?' ওর হাসিটাও গম্ভীর দেখাল। 'আপনি বরং এখন আমাকে ব্রিফ করতে পারেন।'

'রানা, এখনও কিন্তু আমি দ্বিধায় ভুগছি,' বললেন লংফেলো, তাঁর কপালে চিন্তার রেখাগুলো আগের চেয়েও গভীর দেখাচ্ছে। 'তুমি বাঙালি, এই কাজটায় তোমাকে পাঠাতে ভয় পাবার সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, সব কথা তোমাকে আমি খুলে বলতেও পারব না...'

'ঠিক আছে, যতটুকু পারেন ততটুকুই বলুন,' বলল রানা। 'কিংবা আমাকে কী করতে হবে তার একটা আভাস দিন, বাকিটা কাজে নেমে বুঝে নেব আমি।'

'বেশ,' দম নিয়ে শুরু করলেন বিএসএস চিফ। 'তা হলে এই ভাবে সাজানো যাক ব্যাপারটা—অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য আমাদের পৌঁছে দিতে হবে এক বিজ্ঞানীর কাছে।'

'ব্যস?' অবাক হলো রানা।

লংফেলো বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে গ্লাসগো থেকে উধাও হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। সূত্র ধরে খুঁজে বের করতে হবে তাঁকে। গ্লাসগো থেকে তদন্ত শুরু করাই বোধহয় ভাল। বিশ্বাসঘাতকরা তাঁর খোঁজ পাবার আগেই পৌঁছে দিতে হবে তথ্যটা। তিনি কোথায় আছেন জানলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে পারব আমি।'

'এটাই আমার কাজ হবে, তাঁকে খুঁজে বের করা?'

'হ্যাঁ।' ড্রয়ার থেকে দামি সিগার আকৃতির একটা সিল করা অ্যালুমিনিয়াম টিউব বের করলেন লংফেলো। 'এটা তাঁর হাতে তুলে দেয়ার ওপর নির্ভর করছে ব্রিটেনের নিরাপত্তা।' রানার দিকে চেয়ে আছেন লংফেলো, ঘনঘন চোখের পাতা পড়ছে তাঁর। নার্ভাসনেসের লক্ষণ। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন, তরলটা গিলে মুখ বিকৃত করে কিছুক্ষণ থম মেরে থাকলেন, তারপর পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড-সাইজ ছবি বের করলেন। 'ডক্টর অলিভার হপকিন্স। এঁকেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'গ্লাসগোতে কখন যেতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এবার লংফেলোর ড্রয়ার থেকে বের হলো একটা ট্রেনের টিকেট আর ব্যাঙ্কের একটা চেক বুক, প্রতিটি পাতার নীচে দাতার সই। 'এগুলো তৈরিই ছিল। কিন্তু কাকে পাঠাই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, রানা। আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ট্রেন ছাড়া গতি নেই। কাল সকাল এগারোটার ট্রেন ধরতে পার তুমি। ছবির পিছনে ডক্টরের ঠিকানা রয়েছে আর চেকগুলো দিয়ে প্রয়োজন মতো টাকা তুলতে পারবে তুমি, এক মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত।'

ধুরন্ধর বুড়োর উপযুক্ত বন্ধু, ভাবল রানা। বলল, 'ভদ্রলোক ব্রিটেনেই আছেন তা না-ও হতে পারে।...কিন্তু ডক্টর অন্যদেশে চলে গিয়ে থাকলে জানতেন না আপনি? খোঁজ নেয়া হয়নি তিনি দেশেই আছেন কি না?'

'অবশ্যই খোঁজ নিয়েছি,' এতো সাধারণ ব্যাপারেও তাঁদের দক্ষতা সম্বন্ধে

রানা নিশ্চিত নয় এরকম ভাব দেখানোয় বিব্রত বোধ করলেন লংফেলো। 'ডক্টর হপকিন্স যদি সীমান্ত পেরিয়েও থাকেন, আইনসম্মত কোনও পথে যাননি। গ্লাসগোতে আমাদের ওয়াচারের সঙ্গে যোগাযোগ হবে তোমার, ছবির পেছনে তার সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর আছে। যদি মনে করো ডক্টর হপকিন্স অন্য কোনও দেশে চলে গেছেন, তা হলে তাঁকে অনুসরণ করে খুঁজে বের করে টিউবটা তাঁকে দেবে। তাঁর খোঁজ পেলেই জানাবে আমাকে। আমি তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেব।'

ছবি, চেকবুক আর টিকেট পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি তা হলে উঠি।' সোফা ছাড়ল ও। 'গুড নাইট, সার।'

রানার সঙ্গে করমর্দন করলেন লংফেলো। 'ঠিক আছে। আপাতত বিদায়, রানা। আরও একবার বলছি, যদিও না বললেও চলে, টিউবটা ব্রিটেনের নিরাপত্তার জন্যে ভাইটাল। দেখো, ওটা যেন কিছুতেই খোয়া না যায়।'

মৃদু হাসল রানা। 'চিন্তা করবেন না, সার। যদি মারা না পড়ি তা হলে টিউবটা আগলে রাখব।'

'আর সবশেষে—টেক কেয়ার অভ ইয়োরসেল্‌ফ, সান।'

দুই

রানা হিলটনে নিজের ঘরে ফেরার খানিক পরেই ডেস্ক ক্লার্ক যোগাযোগ করল। 'সার, এক ভদ্রমহিলা এসেছেন আপনার কাছে। নাম বলছেন মিস্ সামান্থা লেইটার। তাঁকে কি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেব?'

সঙ্গে সঙ্গে রানা ভাবল, এমআই ফাইভের জন লেইটারের কেউ হয় না কি মেয়েটা? অনেক বছর আগে একবার শুনেছিল, তাঁর একটা মেয়ে আছে। কিন্তু এতো রাতে দেখা করতে এসেছে কেন?

'দরকার নেই,' ক্লার্ককে বলল ও। 'আমিই নীচে নামছি। ওঁকে লাউঞ্জে বসান। আর প্লিজ, হেড ওয়েইটারকে বলে দিন দু'জনের জন্যে কফি দিতে।'

'এখুনি বলে দিচ্ছি, সার!'

গায়ে কোট চাপিয়ে এলিভেটরে করে নেমে এলো রানা, লাউঞ্জে ঢুকতেই ওর চোখ আটকে গেল স্বর্ণকেশী এক তরুণীর ওপর। দরজার দিকেই চেয়ে আছে সে। রানাকে দেখে আগ্রহী চোখে তাকাল। মেয়েটার ডিম্বাকৃতি মুখে মায়াবী বড় বড় চোখ দুটো বাদামি, গায়ের রং সাদা না বলে সোনালী বললেই বর্ণনা কাছাকাছি যায়, দেহবল্লরী সুপার মডেলদের মতো। এক কথায় অপ্সরা। চেহারাটা মেলে, সন্দেহ নেই জন লেইটারের মেয়ে বা বোন হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মেয়েটার সঙ্গে হয়তো খাতির জমাতে চেষ্টা করত রানা, কিন্তু বর্তমান অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

রানা জানতে চায় ও হিলটনে আছে সেটা এই মেয়ে জানল কী করে।

মেয়েটা কি এটাও জানে, বিএসএস-এর একটা কাজ স্বেচ্ছায় করে দিচ্ছে ও?

নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে থেমে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

উঠে দাঁড়াল সামান্থা লেইটার। অন্তত পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে সে লম্বায়। 'আপনিই কি মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনাকেই খুঁজছি। যদি আপনার সময় হয় তা হলে জন লেইটারের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

'কে আপনি? কী জানেন আপনি জন লেইটার সম্বন্ধে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সব জানতাম,' হাসার চেষ্টা করল মেয়েটা, রানার মনে হলো কান্না চাপছে। 'আমি জন লেইটারের মেয়ে।'

ওয়েইটার কফি দিয়ে গেল। মুখোমুখি বসল রানা আর সামান্থা লেইটার। পট থেকে কফি ঢেলে দিল তাকে রানা। সামান্থা লেইটার বলল, 'বাবার মুখে মাঝে মাঝে আপনার নাম শুনতাম। ভেবেছিলাম আপনার বয়সটা তার কাছাকাছিই হবে।'

'দেখলে আমার বয়স কম মনে হয়,' খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টির জন্য বলল গম্ভীর রানা। লক্ষ করেছে, মেয়েটা জন লেইটারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই অতীত কাল ব্যবহার করেছে। 'আপনি কি জানেন আপনার বাবা...'

'মারা গেছে।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'মা আগেই চলে গেছে, এখন বাবাও থাকল না,' বলল সামান্থা লেইটার। 'দুঃখ কি জানেন, শেষ তিনটে বছর বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। কথাবার্তা বলতাম না আমরা। দেখা সাক্ষাৎও হতো না। এখন বুঝতে পারছি, কী হারিয়েছি।'

চুপ করে থাকল রানা, ভাবছে মেয়েটা লেইটারের পেশা সম্বন্ধে জানত কি না। তা ছাড়া, ওকে খুঁজে বের করেছে কীভাবে? পুলিশের কাছে গিয়েছিল, তারা সামান্থা লেইটারকে তথ্য দিয়েছে, বলেছে এই হোটেলে পাওয়া যাবে ওকে? আজ রাতে যা ঘটল তাতে পুলিশের অবশ্য জানার কথা ও কোন্ হোটেলে উঠেছে।

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে শোকাহত একটা মেয়ের সঙ্গে তার মৃত বাবাকে নিয়ে কথা বলতে হবে ওকে।

'আপনি জানতেন আপনার বাবা কোন্ পেশায় ছিলেন?'

'জানতাম।' রানা কিছু বলার আগেই হ্যান্ডব্যাগে হাত ভরে কী যেন খুঁজতে শুরু করল সামান্থা লেইটার। মিনিট খানেক পর জিনিসটা খুঁজে পেয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা দেখলে হয়তো আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আপনি।'

ল্যামিনেটেড ফটো সহ কার্ডটা দেখল রানা। সামান্থা লেইটার এমআই ফাইভের কম্পিউটার অপারেটর। সংস্থাটা বিএসএস-এর মতো গোপন নয়, তবে

ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ তাদেরও। কার্ডটা আসল সেটা নিশ্চিত হয়ে ফেরত দিল রানা।

'এখন বুঝতে পারছেন আমরা একই পেশায় আছি?' সামান্থা লেইটারের বলার ভঙ্গি ব্যগ্র শোনাল। যেন রানাকে কথাটা বিশ্বাস করাতে উদ্‌গ্রীব সে।

রানা লক্ষ করল, কার্ডটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে বের করতে যতোটা সময় লেগেছিল, রাখতেও ততোটা লাগল। সম্ভবত একই জায়গায় রেখেছে আবার। তার মানে গোছানো স্বভাবের মেয়ে।

রানার চোখে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল সামান্থা লেইটার, তারপর বলল, 'আমি সামান্য অপারেটর হতে পারি, কিন্তু তারপরও আমি জানতে চাই আমার বাবার কী হয়েছিল।'

'আপনি তো জানেন আপনার বাবা কোন্ পেশায় ছিলেন,' এড়িয়ে যেতে চাইছে রানা।

'জানতাম,' আবারও বলল সামান্থা লেইটার। এবার তার গলায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার মৃত্যু আমাকে মেনে নিতে হবে। আমি জানতে চাই কীভাবে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে, এবং কেন।'

অস্বস্তি বাড়ল রানার। 'আমি বুঝতে পারছি না, এটা জানতে আমার কাছে এসেছেন কেন। এমআই ফাইভের তো এসব প্রশ্নের জবাব জানা থাকার কথা।'

'এমআই ফাইভের কর্মকর্তারা আমার মতো একটা সামান্য কম্পিউটার অপারেটরকে কিছু বলবে না,' বলল সামান্থা, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে। 'আমার বাবা তাদের সেরা এজেন্ট ছিল, কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আসলে গোটা দুনিয়ায় সেরা পাঁচজন সিক্রেট এজেন্টের একজন হচ্ছেন আপনি।'

আলোচনাটা কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল রানা।

'মিস্টার রানা, আমি বাবার খুনিকে খুঁজে বের করতে চাই।'

রানা মাথা নাড়তেই বাধা দিল মেয়েটা। 'কেন নয়? বাবাও আপনার মতো একই পেশায় ছিল। তার খুনিকে ধরার ব্যাপারে আপনি কি সাহায্য করতে পারেন না? আপনার কাছ থেকে এটুকু সহানুভূতি কি আমি আশা করতে পারি না?'

'আমার পেশায় অনেকেই অকালে মারা গেছে, সামান্থা,' গম্ভীরসুরে বলল রানা। 'তাদের খুনিদের খোঁজা আমার কাজ নয়। সে সময় ও সুযোগও আমার নেই। এ পেশায় অস্বাভাবিক মৃত্যুকে মেনে নিয়েই মানুষ যোগ দেয়।'

'তার মানে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না,' নিচু গলায় বললেও সামান্থা লেইটারের গলা থেকে তীব্র ক্ষোভ ঝরল। 'এম আই ফাইভের ওরাও আমাকে এই একই কথা বলেছে। এটা একটা জীবন-মরণ খেলা, আর খুন হয়ে যাওয়াটা ওই খেলারই অংশ। আপনাদের মতো স্বার্থপর, হৃদয়হীন মানুষের এরকম নিষ্ঠুর কথা আমি মানি না।'

'আমি সত্যি দুঃখিত, সামান্থা,' বলল রানা। 'চাইলেও আমার পক্ষে আপনার বাবার খুনিকে খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে।'

'তুমি তো সেই বিখ্যাত মাসুদ রানা, না?' উঠে দাঁড়িয়ে তিক্ত সুরে বলল সামান্থা লেইটার। 'মহৎহৃদয় মাসুদ রানা! চাইলে তুমি আমার বাবার খুনিকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে পারতে, কিন্তু তুমি আসলে তা চাও না। আমি...আমি তোমাকে বড় মনের মানুষ বলে মানতে পারছি না।'

চুপ করে থাকল রানা।

'বেশ, আমি নিজেই তা হলে খুনিটাকে খুঁজে বের করব,' বলল সামান্থা লেইটার, রাগে কেঁপে যাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, আমি নিজেই বাবার খুনিকে খুঁজে বের করব।'

তরুণী পা বাড়ানোর আগেই চট্ করে তার হাত ধরে ফেলল রানা। 'কী ধরনের বিপদ ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই, সামান্থা। ছেলেমানুষি কোরো না।'

ঝটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সামান্থা। 'কী এমন কাজ আছে তোমার মাসুদ রানা যে তোমার বন্ধুর খুনিকে খুঁজে বের করে তাকে বিচারের সামনে দাঁড় করাতে পারবে না?'

জবাবের অপেক্ষা করল না সে আর, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম ছেড়ে।

পিছন থেকে চেয়ে থাকল রানা। মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বইছে ওর।

রানা বিদায় নিয়ে চলে যেতেই সোফায় গা এলিয়ে বসলেন মার্ভিন লংফেলো। ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন, তাঁর কাজ তাঁকে সবসময় সৎ এবং সত্যবাদী থাকতে দেয় না। রানাকে তিনি অর্ধেকটা সত্যিও বলেননি। বলতে পারেননি। বলা সম্ভব ছিল না। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন তিনি রানাকে। ওই বিপদ থেকে রানা জীবিত বেরিয়ে না-ও আসতে পারে!

তিন

গ্লাসগো। হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে আকাশ ভেঙে। এক ঘণ্টা আগে গ্লাসগোতে পৌঁছেছে ও। পৌঁছেই ফোনে যোগাযোগ করেছে বিএসএস-এর ওয়াচারের সঙ্গে। তার কাছ থেকে ফোন আসবে সেজন্যেই অপেক্ষা করেছে। এক ঘণ্টা পর অধৈর্য হয়ে উঠেছে রানা, খানিক ইতস্তত করে রুম সার্ভিসে যোগাযোগ করেছে, এক পট কফি আর এক বোতল বারবন-এর অর্ডার দিয়েছে। কফি শেষ। আধখালি হয়ে গেছে বারবন-এর বোতল, কিন্তু ওয়াচারের ফোন এখনও আসেনি।

অবসরে জন লেইটার এবং তাঁর মেয়ের ব্যাপারে চিন্তা করেছে রানা। মেয়েটা বোকামি করতে যাচ্ছে। বাবার খুনির পিছনে লাগতে গেলে তাদের হাতে খুন হয়ে যাবে নির্ঘাত।

আরেক পট কফির অর্ডার দেবে কি না ভাবল রানা, ফোন বেজে ওঠায় সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল।

'মিস্টার রানা?' একটা চিকন পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল।

'ভুল নম্বরে ফোন করেছেন,' শীতল শোনাল রানার গলা।

'আরে, তা-ই তো,' খানিকটা আপন মনে বলল লোকটা। 'এটা কি রুম এমআরনাইন? আপনি কি হিসেবটা এখনই বুঝে নেবেন?'

'নেব। তবে অনেক দেরি করেছেন আপনি।'

'দেরির জন্যে সত্যি দুঃখিত। অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'ঠিক আছে, এবার বলুন আমাকে নতুন কী জানানোর আছে আপনার।'

'কিছুই না।'

'কিছুই জানতে পারেননি? তার একটাই মানে, এখনও উনি শত্রুপক্ষের কব্জায় বা অন্য কোনও আগ্রহী দেশের সরকারের হাতে পড়েননি।'

'পড়লেও জানা যাবে না।'

বিরক্ত হলো রানা। 'বাড়িটা তল্লাসী করেছে কে?'

'আমাদেরই একজন।'

'আমি আবার ওখানে খুঁজে দেখতে চাই।'

'আমরা আগেই খুঁজে দেখেছি।'

'এবং কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি যখন, আমাকে আর একবার খুঁজতে হবে,' ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠছে রানার গলা। 'যদি কোনও কিছু দরকার হয় তা হলে আমি আপনাকে ফোন করব।'

'যা ভাল বোঝেন,' গলা শুনে বোঝা গেল অপমানিত বোধ করছে লোকটা। 'গুড ডে।'

লম্বা ট্রেন জার্নি শরীরের ওপর বেশ ধকল ফেলেছে, কাজেই বিকেলের নাস্তা ঘরে আনিয়ে খেল রানা, তারপর বিশ্রাম নিল দু'ঘণ্টা। ডক্টর অলিভার হপকিন্সের বাড়িতে রাতে যাওয়াই ভাল, তাতে কারও চোখে পড়ে যাবার ঝুঁকি কম।

রাত ঠিক দশটায় গায়ে কোট চাপিয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে হোটেল থেকে বের হলো ও। আগেই ওয়ালথার, স্টিলেটো আর গ্যাস বোমাটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে।

রাত বাড়লেও এতো রাত হয়নি যে রাস্তায় লোক চলাচল থাকবে না।

হোটেলের ডোরম্যানকে বলতেই সে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। এরকম রাতে ছাতা নিয়ে বের হয় সবাই। কিন্তু ওর এক হাত অকেজো হয়ে থাকবে বলে নেয়নি রানা। খানিকটা ভিজে বেঁচে থাকাটা শুকনো অবস্থায় মারা যাবার চেয়ে ঢের ভাল।

ট্যাক্সির পিছনের সিটে গা এলিয়ে বসে ডক্টরের ঠিকানা ড্রাইভারকে জানাল ও। কোটের ভেতরের পকেটে রাখা অ্যালুমিনিয়াম টিউবটা একবার স্পর্শ করল। হোটেল ঘরেই কোথাও ওটা লুকিয়ে রেখে আসতে পারত, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হতো না, পেশাদার কেউ ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলত জিনিসটা। তার

চেয়ে টিউবটা সঙ্গে রাখাই ভাল। অন্তত জানা থাকছে যে ওটা কোথায় আছে। টিউবটা কেড়ে নিতে হলে ওকে খুন করতে হবে। আর খুন যদি ও হয়েই যায় তা হলে টিউবটার কী হলো সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না ওকে।

দুটো কাজ একই সঙ্গে করতে হবে, মনে মনে হিসেব কষল রানা। এক, ডক্টর হপকিন্সকে খুঁজে বের করা। দুই, বেঁচে থাকা।

ট্যাক্সি থেমে যেতেই ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা। বৃষ্টির মধ্যে একটু কুঁজো হয়ে আছে, ঠিকানা মিলিয়ে লম্বাটে, উঁচু একটা বাড়ির দিকে এগোল।

বেশ অনেকগুলো ধাপ বেয়ে উঠতে হলো রানাকে। সদর দরজার নবে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল রানা। ফয়ে এটা। দীর্ঘ করিডর চলে গেছে বাড়ির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দু'পাশে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। ফয়েতে ছয়টা ডাক বাক্স আছে। কোনওটার গায়েই ডক্টর হপকিন্স লেখা নেই। তবে একটা বাক্সের গায়ে ডক্টর এ হকিন্স লেখা আছে। ওয়াচারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গত সপ্তাহে এ-বাড়িতে ওঠার পর থেকে এ হকিন্স নামেই নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন ডক্টর। ডক্টরের ফ্ল্যাটটা তিন তলায়। উঠে এলো রানা সিঁড়ি বেয়ে। সামনেই করিডর। দু'পাশে ঘরের বন্ধ দরজা। সোজা স্টেনসিল করে এ হকিন্স লেখা দরজার সামনে এসে থামল ও। কান পেতে অপেক্ষা করল আড়াই মিনিট। ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

মিনিট খানেক লাগল ওর লকপিক দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকতে। ওয়ালথার হাতে সাবধানে ঘুরে দেখল পুরো ফ্ল্যাট। সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিল, তারপর ড্রইং রুমের ছোট একটা ল্যাম্প জ্বালল। এবার কিচেনে চলে গেল। ওখান থেকে একটা ডিশ টাওয়েল নিয়ে এসে গুজে দিল ফ্ল্যাটের দরজার নীচে। এখন আর বাইরের করিডর থেকে আলোর রেখা দেখা যাবে না। কাজটা সেরে ভেজা কোট খুলে ফেলল ও। ওটা একটা চেয়ারের পিঠে রেখে এবার শুরু করল আসল কাজ। ফ্ল্যাটে লিভিংরুম, ড্রইংরুম, বেডরুম, দুটো টয়লেট আর কিচেন আছে–সব ভাল মতো খুঁজে দেখতে হবে ওকে।

বেডরুম দিয়ে আরম্ভ করল রানা। চেস্ট অভ ড্রয়ার্সের ড্রয়ারগুলো সব খোলা। ক্লযিটটাও অগোছাল। তাড়াহুড়ো করে চলে গেছেন ডক্টর হপকিন্স। কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না বেডরুমে খুঁজে। এরপর গোটা কিচেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। জানে না কী খুঁজছে, কাজেই সিরিয়াল বক্স, চিনির বয়াম কোনও কিছু বাদ রাখছে না। লুকানোর মতো সব জায়গা খুঁজেও কিছুই পেল না। লিভিংরুমেও ফলাফল হলো একই। টয়লেটগুলোতেও কিছু নেই। তবে বোঝা গেল তাড়াহুড়ো করে চলে গেছেন ডক্টর, এবং যাবার সময় এমন কিছু ফেলে যাননি যা দেখে বোঝা যাবে কোথায় গেছেন তিনি।

আধভেজা কোটটা আবার পরে নিল রানা, শেষবারের মতো চারপাশে নজর বুলাল। ডক্টর কোথায় গেছেন তার কোনও সূত্র যদি থাকত তা হলে সেটা ঠিকই চোখে পড়ত ওর। নেই। কানাগলি এটা। এখানে দ্বিতীয়বার আসার আর

কোনও মানে হয় না।

নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি যদি প্রাণভয়ে ভীত একজন বিজ্ঞানী হতাম তা হলে কোথায় পালাতাম?

আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। এভাবে চিন্তা করে কোনও লাভ হবে না, কারণ বিজ্ঞানী ওর মতো এসপিয়োনাজ এজেন্ট নন। যুক্তি মেনে সব কাজ করবেন না ভদ্রলোক, অনুভূতির মাধ্যমে পরিচালিত হবেন।

দরজা বন্ধ করে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এলো রানা। সিঁড়িতে কেউ নেই। নীচে নামল। ফয়ে পেরিয়ে সদর দরজার কাছে পৌঁছাবার পর মনটা খচ্খচ্ করে উঠল। কী যেন ওর মনোযোগ টেনেছিল ক্ষণিকের জন্য। সাদা একটা কিছু। মেইল বক্সগুলোর কাছে আবার ফিরে এলো রানা। এ হকিন্স লেখা ডাক বাক্সে একটা এনভেলাপ বা সাদা কাগজ আছে। সামান্য দেখা যাচ্ছে ওটার একটা কোনা। স্টিলেটো দিয়ে খুঁচিয়ে মেইল বক্সের ওপরের অংশ সরিয়ে ফেলল ও, হাত ভরে বের করে আনল জিনিসটা। একটা এনভেলাপ। ওপরে লেখা ডক্টর এ হকিন্স। পোস্টেজ স্ট্যাম্পটা দেখল, সিলের তারিখটা দু'দিন আগের।

খামটা কোটের ভেতরের পকেটে রাখল রানা, বেরিয়ে এলো বাড়িটা থেকে।

চার

বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে এখন। তবে শীত বেড়েছে আগের চেয়ে। কোটের কলার ওপরে তুলল রানা। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে নামতে শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে উঠল। কারণটা শীতল আবহাওয়া নয়। গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি, তবে রেইলিঙে বুলেট লেগে পিছলে বেরিয়ে যাবার শব্দ ওর অতি পরিচিত।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ডানদিকের রেইলিং টপকে নীচে পড়তে শুরু করল। পতনটা যা ভেবেছিল তার চেয়ে দীর্ঘ হওয়ায় পেটের ভেতর গিঁঠ পাকানো একটা অনুভূতি হলো ওর। মনে হলো পড়ছে তো পড়ছেই। যেন না দেখেই বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে, জানে না কত নীচে মাটি। অন্ধকারে দেখতে পায়নি, ধরে নিয়েছিল পাশের বাড়িটাও যথেষ্ট উঁচু হবে, সেটারও একটা সিঁড়ি থাকবে।

কিন্তু ওর ধারণা ভুল। ধপাস করে একটা সরু প্যাসেজে পড়ল ও। একইসঙ্গে দু'পা দিয়ে পড়ল। এক পা পিছলে গেল বৃষ্টি-ভেজা মেঝেতে। ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ল রানা। বেশ জোরেই মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। কাদা-পানি লেগে নোংরা হয়ে গেল কাপড়চোপড়। শরীরটা স্থির হলো হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে। মনে হলো সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে, জ্ঞান হারাবে যে-কোনও মুহূর্তে। আবছা ভাবে বুঝতে পারছে সরে যেতে হবে এখান থেকে, নইলে খুন হয়ে যাবে। গুলি যে করেছে সে নিশ্চয়ই দেখতে আসবে ও মারা গেছে কি

না। সম্ভবত রাস্তা পার হয়ে এদিকেই আসছে সে এখন।

ওকে রেইলিং টপকে নীচে পড়ে যেতে দেখে আততায়ী ভাবতে পারে গুলির ধাক্কায় আহত হয়েছে ও। প্যাসেজের ভিতর দিকে তাকাল রানা, ঘোলা লাগছে সব। তবে বুঝতে পারছে, লোকটা এখন রাস্তার দিক থেকে প্যাসেজের মুখে এসে দাঁড়ালে কোনও দিকে সরার উপায় থাকবে না ওর। আড়ালে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে ওর ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করতে পারবে লোকটা।

প্যাসেজের ভিতর দিকে চলে আসছে রানা। দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল। কংক্রিটের বদলে একদিকে কাঠের স্পর্শ পেল হাতে। একটা দরজা। টলতে টলতে উঠে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ওটা তালা দেয়া। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল রানা। স্টিলেটো বের করে তালার বোল্ট আর দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিল। ক্লিক করে একটা শব্দ তুলে খুলে গেল বোল্ট। ঠেলা দিতেই ভেতরের দিকে খুলল দরজা। ওপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। ঢুকে পড়ল ও ভিতরে, দরজা টেনে দিল। ঠক্ করে জোর আওয়াজ হলো দরজায় বুলেট বাধা পাওয়ায়। আরেকটা গুলি দেয়ালে লেগে রাগী ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে বারবার দিক বদলাচ্ছে।

আততায়ী এবার প্যাসেজের ভিতর ঢুকে পড়বে। দরজা খুলতে ওর যেমন দেরি হয়নি, তেমনি ওই লোকেরও দেরি হবে না। এখন রানা দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে পিস্তল হাতে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। যদি ও মুখোমুখি লড়াইয়ে হেরে যায় তা হলে গুলি খেয়ে মরবে, অ্যালুমিনিয়াম টিউবটা চলে যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। আততায়ী যে-ই হোক সে বেশ কয়েকজন এজেন্টকে খুন করেছে। লোকটাকে খাটো করে দেখার কোনও সুযোগ নেই।

বাতির সুইচ খুঁজতে শুরু করল রানার বাম হাত। ডান হাতে শক্ত করে ওয়ালথারটা ধরে রেখেছে। সুইচ পেতেই অন করল, জ্বলে উঠল পঁচিশ ওয়াটের দুর্বল একটা বাতি। এটা এ-বাড়ির বেযমেন্ট। মিটমিটে হলদে আলোয় দরজার আড়াটা পাশেই দেখতে পেল রানা। চট্ করে ওটা দরজায় আটকে দিল। এবার দরজা না ভেঙে ঢুকতে পারবে না লোকটা। বেযমেন্টের ওপাশে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পেয়ে ওদিকে পা বাড়াল ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পেল। আততায়ী যদি তালাতে গুলি করেও, তবুও আড়াটার কারণে তার পক্ষে দরজা খোলা সম্ভব হবে না।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে রানা আশা করল এই দরজাটা খোলা থাকবে। কপাল ভাল ওর। নব ঘুরিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল কাঠের তৈরি ভারী দরজা। সামনেই একটা করিডর। সিলিঙে দুর্বল বাতি জ্বলছে বিশ ফুট পর পর। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে ল্যান্ডিং পেরিয়ে করিডরে ঢুকে পড়ল ও, অসাবধানতার কারণে পিছনে বেশ আওয়াজ করে বন্ধ হলো দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে করিডরের এক পাশের একটা দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে এসে দাঁড়াল এক মহিলা। খানিকটা দূরে থাকায় রানাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না সে।

‘কে ওখানে?’ উদ্বেগের কারণে বেসুরো শোনাল মহিলার গলা।

কর্কশ আওয়াজ বের হলো রানার গলা থেকে, ‘ভয় পাবেন না।’ করিডরের দেয়ালে এক হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল রানা।

‘ভয় পাচ্ছি না,’ সামান্য দ্বিধা করে বলল মহিলা। ‘তবে মনে হচ্ছে আপনি ভয় পেয়েছেন। ...কী করছেন এখানে আপনি?’

বার কয়েক ঢোক গিলে রানা বলল, ‘বললে বিশ্বাস করবেন না, ওর স্বামীটা যে হঠাৎ কোত্থেকে এসে–!’

মহিলার বয়স চল্লিশের কোঠায়। শক্ত-পোক্ত শরীর। গায়ের রোবটা আরও ভাল ভাবে জড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা সামনে বেড়ে রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। তারপর ওর বয়স আন্দাজ করে নিয়ে বলল, ‘তুমি ছোকরা দেখতে যেমন তাতে মেয়েরা তো পটবেই, লাভ! ওদের দোষ নেই। আর মেয়েদের স্বামীরা যে খেপে যাবে তাতেই বা সন্দেহ কী!’ খানিক কী যেন ভেবে বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের ঘরের দরজা দেখাল মহিলা। ‘লুকাতে চাও আমার ঘরে? আমার ওখানে কেউ তোমাকে খুঁজবে না।’

‘খুব ভাল হয় কিছুক্ষণ আপনার ওখানে বসতে পারলে,’ বলল রানা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে, টলছে অল্প অল্প। ‘আপনার স্বামী আবার কিছু মনে করবেন না তো?’

‘না।’ একটু থেমে বলল মহিলা। ‘গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ও।’

‘সত্যি দুঃখিত।’

‘এসো, লাভ!’ এক পাশে সরে দরজাটা আরও খুলে দাঁড়াল মহিলা। রানা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকতেই ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

‘কয়টা অ্যাপার্টমেন্ট আছে একতলায়?’ তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আটটা।’ মৃদু হাসছে মহিলা। ‘নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এত রাতে সবাইকে ডেকে তুলবে না তোমার ওপর খেপে যাওয়া স্বামী।’ সোফা দেখাল। ‘বসো, লাভ। ড্রিঙ্ক দেব তোমাকে? সামান্য ড্রিঙ্ক করলে সুস্থির লাগবে।’

রাহাত খানের আদেশ-উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল রানার। *শরীর ভরা অ্যালকোহল আর নিকোটিন নিয়ে, রানা, ইউ আর গোইং টু বি অ্যান আনফিট অ্যান্ড আনরিলায়েবল এজেন্ট। তোমার প্রেশার বেড়ে গেছে, লিভার ঠিক মতো কাজ করছে না। ফিযিশিয়ান রেকোমেন্ড করেছেন···* কাউন্ট দুয়ার্তের সঙ্গে মোলাকাতের পর সব্জিওয়ালা ডাক্তারের সেই নিরামিষ সর্বস্ব ভয়ানক হার্বারিয়াম থেকে বেরিয়ে খুব কমই ড্রিঙ্ক করেছে ও। কিন্তু সত্যি, এখন পেটে উত্তেজক কিছু পড়লে ভাল হত।

আস্তে করে ব্যথায় ঝিমঝিম করা মাথাটা ঝাঁকাল রানা। ‘ধন্যবাদ। দিন।’ মহিলা ভিতরের ঘরে চলে যাওয়ায় ভেজা ওভারকোট খুলে ফেলল ও। ওটা একটা কাঠের চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে সোফায় বসল। ওয়ালথার, স্টিলেটো আর গ্যাস বোমাটা কোটের পকেটে রেখে দিয়েছে। এবার ক্ষয়-ক্ষতি কী হয়েছে সেদিকে মনোযোগ দিল। হাঁটুর কাছে দুই জায়গাতেই ভিজে গেছে প্যান্ট, কিন্তু ছিঁড়ে

যায়নি। অবশ্য ভীষণ ব্যথা করছে হাঁটু দুটো; জ্বলছে, যেন আগুন ধরে গেছে ওগুলোতে। কাঁধের ব্যথাটাও অসহ্য। তবে হাড় ভাঙেনি কোথাও। মাথার ব্যথাটা কমছে। অকুণ্ঠচিত্তে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। মাথায় যদি আরও জোরে আঘাত লাগত তা হলে অবশ হয়ে যেত শরীর, হয়তো জ্ঞান হারাত, সেক্ষেত্রে আততায়ীর সহজ শিকারে পরিণত হত ও।

চারপাশে এবার তাকাল। অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ উষ্ণ। উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে রাখা একটা পোর্টেবল হিটার থেকে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। আসবাব-পত্র যদিও খুব দামি নয়, তবে সাজানোতে সুরুচির ছাপ আছে।

'হুইস্কি চলবে তো, লাভ?' ট্রেতে করে একটা বোতল, পানির জগ আর একটা গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল মহিলা, ট্রে-টা রানার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'চলবে।' সোনালী তরল ভরা গ্লাসটা ট্রে থেকে তুলে নিয়ে হালকা চুমুক দিল রানা।

ওর গা ঘেঁষে বসল মহিলা। 'পানি দিইনি হুইস্কিতে। একদম নির্জলা। তোমাকে দেখে মনে হয়েছে ভাল হুইস্কি বমি করে নষ্ট করার মতো খারাপ ছোকরা নও তুমি, লাভ।'

সত্যি, হুইস্কিটা প্রথম শ্রেণীর।

রানার চোখে সাগর-নীল মায়াভরা চোখ রেখে ওর ভেজা হাঁটুতে হাত দিল মহিলা। 'তোমার প্যান্ট ভিজে গেছে, লাভ! খুলে ফেলো।'

'হ্যাঁ?' ঠিক শুনেছে কি না বুঝতে পারল না রানা।

রানার নাকের কাছাকাছি চলে এলো মহিলার লালচে নাক। চেহারাটা হাসি-হাসি। 'বলছি প্যান্ট খোলো, লাভ। হিটারের সামনে একটা চেয়ারে ঝুলিয়ে দেব, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।'

'দরকার নেই,' মহিলার সামনে জ্যাকেট ও আন্ডারপ্যান্ট পরে বসতে রাজি নয় রানা। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে ও। ব্রিটিশ মহিলারা সাধারণত অপরিচিত কারও সঙ্গে সহসা সহজ হয় না। এই মহিলার আচরণ ওর কাছে অতিরিক্ত আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে।

'আরে, লাভ, লজ্জা কীসের?' চট্ করে রানার প্যান্টের বোতামটা খুলে ফেলল মহিলা। 'সর্দি লেগে যাবে ভেজা প্যান্ট পরে থাকলে। তোমার জুতোও তো দেখছি ভেজা, লাভ! দাঁড়াও, সব খুলে ফেলব।'

বলে কী! রানা বুঝতে পারল না ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোয় পড়েছে কি না। ও কি এই মুহূর্তে কেটে পড়বে এখান থেকে?

মৃদু হাসছে মধ্যবয়স্কা মহিলা, সাগরের মতো নীল চোখে ঝিকঝিক করছে দুষ্টুমি। রানার আপত্তি সত্ত্বেও দ্রুত হাতে জুতো আর মোজা খুলে ফেলল সে, তারপর দুই টানে ওর প্যান্টটা নামিয়ে দিল গোড়ালির কাছে, পা গলিয়ে বের করে নিল ওটা। এবার বলল, 'আমার ছোট ভাইটাও তোমার বয়সী, লাভ। তোমার মতোই দুষ্টের চূড়ামণি ছিল। বিয়ে করে এখন ভদ্রলোক হয়ে গেছে।'

আন্ডারপ্যান্ট আর শার্ট পরা রানার এবার মনে হলো ও একটা স্কুলের বাচ্চা, আর দুষ্টুমি করে এখন টিচারের শাসনের মুখে পড়েছে। 'আসলে কারও স্বামী আমাকে খুঁজছে না,' বলল ও। বলার পর মনে হলো ও যে ভাল সেটা টিচারের কাছে প্রমাণ করতে চাইছে। মেজাজটা গরম হয়ে উঠতে চাইল ওর, কিন্তু সর্ব অঙ্গের ব্যথায় মনটা দমে আছে।

'নিশ্চয়ই, লাভ!' ঘন ঘন লালচে চুল ঝাঁকাল মহিলা। কারও স্বামী রানাকে খুঁজছে না সেটা সে বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না। 'ও, ভাল কথা, আমার নাম জোয়ানা মিচেল। তোমার?'

'মাসুদ রানা।'

ওর প্যান্ট আর জুতো-মোজা হিটারের সামনে ঝুলিয়ে দিল জোয়ানা। হিটারটা একটু সরাল, যাতে ওভারকোটেও গরম বাতাস লাগে। ফিরে এসে বসল রানার পাশে, বলল, 'আমি সেইন্ট মার্টিন্স স্কুলের অফিস-সেক্রেটারি। এখানে, এই আস্তাকুঁড়ে পড়ে আছি কেন, জানো? এরচেয়ে ভাল কোথাও থাকার মতো টাকা আসলে নেই আমার।' আন্তরিক হাসল জোয়ানা। হাসতেই খুব মিষ্টি লাগল তাকে দেখতে। মনে হলো প্রাচুর্য না থাকায় সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়, যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট। 'তবে তোমাকে স্বীকার করতে হবে, লাভ, কোথাও কোনও ধুলো-ময়লা নেই।'

আসলেই সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। রানা মনে মনে ভাবল, জোয়ানার ভাই যে ভাল মানুষ হয়ে যেতে বাধ্য হবে তাতে আর সন্দেহ কী, দশ মিনিটও হয়নি ও ঢুকেছে এই অ্যাপার্টমেন্টে, প্রথমে খানিকটা ভড়কে গিয়েছিল যদিও, কিন্তু ইতিমধ্যেই সহজ-সরল, আন্তরিক আচরণ দিয়ে ওকে আপন করে নিয়েছে জোয়ানা, খানিকটা শাসনও করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসনটা ওর খারাপ লাগছে না।

'আহা, হাঁটুগুলোর অবস্থা দেখো!' জিভ দিয়ে চুকচুক করে আওয়াজ করল জোয়ানা। 'বলছি না হাঁটুগুলো সুন্দর নয়, লাভ, তবে ছড়ে গেছে বাজে ভাবে।'

রানা খেয়াল করে দেখল আসলেই চামড়া ছিলে গেছে। পড়ার সময় জোর ঘষা খেয়েছে সিমেন্টে। কাঁধের ব্যথায় মুখটা কুঁচকে গেল ওর।

'আবার কী হলো, লাভ?' উদ্বিগ্ন চোখে রানাকে দেখছে জোয়ানা।

'পা পিছলে পড়ার সময় কাঁধে লেগেছে।'

'আহারে, পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে? যার সঙ্গে লেগেছিলে সে বোধহয় আস্ত দানব একটা,' সহানুভূতির সুরে বলল জোয়ানা। 'দেখে তো তোমাকে যথেষ্ট ফিট বলে মনে হচ্ছে, তারপরও লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে তোমাকে।'

'পড়ার আগে ফিটই ছিলাম,' হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল রানা। 'আমাকে কেউ ছুঁড়ে ফেলেনি, পা পিছলে পড়েছি।'

'ছেলেমানুষ, এ-কথা তো বলবেই!' আগের চেয়েও বেশি সহানুভূতি ঝরল জোয়ানার কণ্ঠে। 'তুমি তো, লাভ, স্বীকার করবে না যে তোমাকে আলুর বস্তার

মতো ছুঁড়ে ফেলেছে ওই দস্যুটা। এবার জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে হয়!'

'না!' আতঙ্ক চেপে রেখে আপত্তি করল রানা। 'জ্যাকেট খোলা যাবে না।'

'জ্যাকেট খোলা যাবে না? কেন?' জোয়ানা বিস্মিত।

'ইয়ে... মানে... খুললে...খুললে তুমি ভয় পেয়ে যাবে।'

'কে বলেছে, কক্ষনো না! আমি ভয় পাবার মানুষই নই।' বলতে বলতে একরকম জোর করেই রানার গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে নিল জোয়ানা।

রানা যা ভয় করেছিল তার কিছুই ঘটল না। ওকে শোল্ডার হোলস্টার পরে থাকতে দেখে আরও বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জোয়ানা। 'ও আচ্ছা, বুঝেছি, তুমি তা হলে পুলিশে আছ! বাহ্, ভারী খুশি হলাম। স্বামীটা জানলে... কী করবে জানলে? নিশ্চয়ই আরও রাত করে বাড়ি ফিরবে?' হেসে উঠল নিজের রসিকতায়।

খোলা জ্যাকেট চেয়ারের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল জোয়ানা। 'গরম ভেজা কাপড়ের শেঁক দিয়ে একটা মলম মালিশ করলেই ব্যথা কমে যাবে। আমি কাপড় আর মলম নিয়ে আসি, ভেগে যেয়ো না যেন, লাভ। মলমের সঙ্গে হুইস্কি আর পারফিউম মিশিয়ে এমন একটা পুলটিস করে দেব যে ব্যথা বাপ-বাপ করে পালাবে।'

রানা বুঝতে পারছে এই মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। একটু পরেই সোফায় চিৎ হয়ে শুতে হলো রানাকে। ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে নিজস্ব সুগন্ধী মালিশ দিয়ে কাঁধের আহত জায়গাটা ডলতে শুরু করল জোয়ানা, সেই সঙ্গে বিরতি দিয়ে চলছে গরম শেঁক। ওর ভাই বোধহয় প্রায়ই মারামারি করে ফিরত, দেখা গেল প্রথমে একটু জ্বললেও সত্যিই মালিশটা মাখানোর পর ব্যথা অনেক কমে গেছে। হাঁটুর ওপরও একই চিকিৎসা চলল। আধঘণ্টা পর রানার মনে হলো এক দৌড়ে পাঁচ মাইল ঘুরে আসতে পারবে।

'আর মালিশ করতে হবে না, ব্যথা প্রায় নেই বললেই চলে,' উঠে বসল রানা।

সন্তুষ্ট চেহারায় মাথা ঝাঁকাল জোয়ানা। 'তো, লাভ, এখন কী করবে, রাতে কি এখানে এই ইঁদুরের গর্তেই আশ্রয় নেবে, না কি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে?'

'বাড়ির পেছন দিয়ে বেরোনোর পথ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ব্যস্ত হাতে পোশাক পরছে। জ্যাকেট, প্যান্ট, ওভারকোট সব শুকিয়ে গেছে, পরে নিল ঝটপট।

'বেশ কয়েকটা পথ আছে, লাভ। তবে একটা দরজা দিয়ে বের হলে তুমি অন্ধকার একটা সরু গলি পাবে। ওটা মেরিগেল্ডা লেনে পড়েছে। তবে আমি বলি কী, লাভ, রাতটা আমার এখানেই থেকে যাও। আবার যদি ওই লোক তোমাকে পায় তা হলে একেবারে আলুভর্তা বানিয়ে ফেলবে।'

'না, যেতে হবে আমাকে,' বলল রানা। বুকটা ভরে গেছে ওর মহিলার আন্তরিক ব্যবহার ও নিখুঁত সেবা-যত্ন পেয়ে। কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল, 'আমি আবার কোনও একদিন আসব, জোয়ানা। আমাকে তুমি মনে রাখবে তো? আমি চিরদিন

মনে রাখব এখানে আমার একটা বোন থাকে।'

'আমিও মনে রাখব, লাভ!' ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল জোয়ানা। 'বুঝতে পারছি তুমি থাকবে না, কাজেই চলো, তোমাকে সেই দরজাটা দেখিয়ে দিই।'

আট মিনিট পর অন্ধকার গলি-মুখের কাছে দাঁড়াল রানা, হাত নেড়ে জোয়ানার কাছ থেকে বিদায় নিল। পিস্তলটা চলে এসেছে রানার হাতে। অতি সাবধানে ছায়ার সঙ্গে মিশে, ছায়ারই মত নিঃশব্দে এগোল সামনে। নাহ্, কেউ গুলি করল না ওর দিকে। লোকটা চলে গেছে, নাকি পাহারা দিচ্ছে অন্য গলি? ঢুকে পড়ল ও ডানদিকের গলিতে। এবং থমকে দাঁড়াল।

হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা লোক। ভঙ্গিটা দেখেই বোঝা যায় দেহে প্রাণ নেই। হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তল।

দ্রুত হাতে লোকটার পকেট হাতড়ে দেখল রানা–কিছুই নেই যা দিয়ে চেনা যাবে। পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল। মোট তিনটে গুলি করা হয়েছে এটা দিয়ে।

সম্ভবত ওরই দিকে।

কে মারল লোকটাকে?

পাঁচ

পরের গলিটায় ঢুকে প্রথমে অস্বস্তি বোধ করল রানা। পথটা এত সংকীর্ণ হবে সেটা ভাবতে পারেনি। দুটো বাড়ির দেয়ালের মাঝখানে সামান্য ফাঁক বললেই চলে। একটু পরেই পাশ ফিরে এগোতে হলো ওকে। এখন যদি কেউ গলির মাথা থেকে গুলি করে, তা হলে সহজ শিকারে পরিণত হবে ও। কিন্তু কিছুই ঘটল না, নিরাপদেই বেরিয়ে এল ও অপেক্ষাকৃত বড় গলিতে।

মেরিগেল্ডা লেন পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল রানা, একটু পর পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সোজা হোটেলে ফিরল ও, এলিভেটরে করে উঠে এলো চারতলায়। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল ওটা। এন্ট্রান্স ফয়েতে ঢুকল ও। ফয়েতে একটা কাউচ ও ক্লজিট আছে। ফয়ে পেরিয়ে ওর বেডরুম।

হ্যাঙ্গারে কোট ঝুলিয়ে রাখল রানা, চট্ করে ওর হাতে বেরিয়ে এলো ওয়ালথারটা। যত্নের সঙ্গে নিঃশব্দে সেফটি ক্যাচ অফ করল ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করে দিয়েছে। অনুভূতিটা চেনে। বিপদের আভাস পাচ্ছে অবচেতন মন। এই সুইটে আরও কেউ আছে। বেডরুমের বাতিটার সুইচ ফয়ের শেষ প্রান্তে। নিঃশব্দে ওখানে চলে গেল রানা, বাম হাতে সুইচটা অন করল। ডান হাতে ওয়ালথার তৈরি। বাতি জ্বলে ওঠায় দু' পা এগিয়ে ফুটখানেক সরেই এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, পিস্তলটা এখন দু' হাতে ধরে আছে, মুহূর্তের নোটিসে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করতে পারবে।

'ক্রাইস্ট!' ধড়মড় করে উঠে বসল সামান্থা লেইটার। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ!'

ওর বিছানায় শুয়েছিল সামান্থা, তারপর বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় চমকে গেছে।

'সামান্থা!' পিস্তল নামাল রানা, 'এখানে কী করছ তুমি!'

'আমি বলেছিলাম নিজেই তদন্ত করব, মনে আছে?' স্কার্ট ঠিক করল সামান্থা লেইটার, সোনালী হাঁটুর নীচে নামিয়ে দিল ওটা। 'তোমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি।'

'আমাকে অনুসরণ করে এসেছ?' একই সঙ্গে রাগ আর বিরক্তি অনুভব করল রানা। মেয়েটাকে ও ঠিকই দেখত ওর পিছু নিলে। না কি ও এত অসতর্ক হয়ে পড়েছে যে ওর চোখ এড়িয়ে গেছে মেয়েটা?

'ঠিক সেই অর্থে অনুসরণ নয়,' ব্যাখ্যা করল সামান্থা লেইটার। 'আমি জানতে পারি তুমি গ্লাসগোতে আসছ, কাজেই আমিও চলে এলাম।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'জানলে কী করে?'

'এমআই ফাইভ কন্ট্যাক্ট,' মৃদু হাসল সামান্থা। 'টপ সিক্রেট।'

'এমআই ফাইভ জানে আমি এখানে এসেছি?' উঠে দাঁড়াল রানা। ওয়ালথারটা হোলস্টারে রেখে দিল। ব্যাপারটা রানার পছন্দ হচ্ছে না। ওদের জানার কথা নয়, যদি না মার্ভিন লংফেলো বলে থাকেন। তিনি কি বলবেন? সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তা হলে? এমআই ফাইভ কি বিএসএস-এর ওপর দিয়ে ফোঁপর দালালী করছে?

'আমার অফিসের টার্মিনাল থেকে মেইন কম্পিউটারে ট্যাপ করি আমি,' বলল সামান্থা। রানার গম্ভীর চেহারা দেখে যোগ করল, 'তোমার এতো রাগের কোনও কারণ নেই; এম আই ফাইভ অনেক কিছুই জানে অনেকের সম্বন্ধে।'

'আমার এখানে আসার কথা তাদের জানা থাকার কথা নয়,' বলল রানা। 'এখানে আমার ঘরে এলে কী করে?'

'একটা রুম ভাড়া করেছি আমি এ হোটেলে, তারপর তোমার স্যুইটের চাবি...'

'নিজের নামে রুম নিইনি আমি,' সামান্থাকে থামিয়ে দিল রানা। ক্রমেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে ও।

'ক্লার্ককে তোমার চেহারার বর্ণনা দিই, একটা ব্যর্থ প্রেমের করুণরসে সিক্ত কাহিনি শোনাই, তারপর তার সাহায্য চাইতেই সে তোমার সুইটের চাবি দিয়ে দেয়।'

'এম আই ফাইভের কম্পিউটার থেকে আরও অনেক কিছুই নিশ্চয়ই জেনেছ?' জ্যাকেট আর শোল্ডার হোলস্টার খুলে ফেলল রানা।

'না,' হাসল সামান্থা। 'তবে একজন এজেন্টের সঙ্গে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেছিলাম। সে আমাকে কিছু কৌশল শিখিয়েছে।'

'নাম কী তার?'

রানার চোখের দিকে তাকাল সামান্থা। 'জানতে চাইছ যাতে তার নামে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারো? বলব না।'

'কী চাও তুমি, সামান্থা?' শার্ট খুলে ফেলল রানা। কাঁধটা আবার আড়ষ্ট ঠেকছে। গরম পানিতে গোসল ওর এখন না করলেই নয়।

দু'পা একসঙ্গে ঘুরিয়ে বিছানা থেকে নামল সামান্থা। 'আমি শুধু তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে আমি এসেছি।'

'জানিয়েছ,' কঠোর শোনাল রানার গলা, 'এবার নিজের ঘরে ফিরবে তুমি? আমাকে এখন গোসল করতে হবে।'

নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল সামান্থা, 'তুমি চাও আমি তোমার পিঠ ডলে দিই?'

মেজাজ সামলাতে কষ্ট হলো রানার। 'নিজের ঘরে যাও, সামান্থা। আমার পিঠ আমিই ডলে নেব।'

'বুঝতে পারছি মেজাজ ভাল নেই তোমার,' বলল সামান্থা। 'জানি জিজ্ঞেস করা উচিত নয় এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী করছিলে তুমি।' রানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো সে, চেহারাটা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল, দ্রুত পিছাল এক পা। 'পারফিউমের গন্ধই বলে দিচ্ছে কী করছিলে এতো রাত পর্যন্ত,' শীতল শোনাল তার গলা। বিছানা থেকে হাত-ব্যাগটা তুলে নিল সে পাশ ফিরে, ফয়েতে চলে গিয়ে বলল, 'মাসুদ রানা, বুঝতে পারলাম অনেক পরিশ্রম করেছ তুমি আজ রাতে, বিশ্রাম দরকার তোমার!'

'আমার নৈতিক অধঃপতন দেখে মর্মাহত হওয়ার অভিনয়টা জমছে না, সামান্থা। তুমি স্রেফ অনধিকার চর্চা করছ,' রানার কণ্ঠে ধমকের সুরটা স্পষ্ট। 'তোমাকে আর দেখতে না পেলেই খুশি হব আমি।'

দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সামান্থা। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। 'তোমার মত আমিও জন লেইটারের খুনিকে খুঁজছি, কাজেই, না চাইলেও দেখা হয়ে যেতে পারে, মিস্টার।'

'এক মিনিট,' বলল রানা। 'কে বলল তোমাকে আমি জন লেইটারের খুনিকে খুঁজছি? তাঁর খুনিও যে ওই একই জায়গায় খুন হয়েছে, তুমি জানো না?'

কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সামান্থা। 'হোয়াট?' বেসুরো আওয়াজ বেরুল গলা থেকে।

'আশা করি এখন তুমি লন্ডনে নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে কমপিউটার নিয়ে বসবে,' বলল রানা।

'না, তা আমি করব না,' বলল সামান্থা, দ্রুত সামলে নিচ্ছে নিজেকে। 'কারণ বাবার সঙ্গে যে লোকটা খুন হয়েছে সে নগণ্য একটা ঘুঁটি মাত্র, আর আমার টার্গেট তাকে যারা বাবার পেছনে লাগিয়েছিল তারা।' চোখ সরু করে রানার প্রতিক্রিয়া দেখল সে, ঘুরল, তারপর বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

ছয়

গরম পানির টাবে পুরো আধঘণ্টা শরীর ডুবিয়ে রাখল রানা। হাঁটু আর কাঁধের আহত জায়গায় গরম পানির স্পর্শ আরামদায়ক একটা অনুভূতির সৃষ্টি করল। কামরার দরজাটা ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে আটকেছে ও, তারপরেও টাবের পাশেই কাউন্টারে রেখেছে ওয়ালথারটা। সতর্ক থাকাই ভাল। সামান্থা লেইটার যদি ওর খোঁজ পেয়ে যেতে পারে, তা হলে অবশ্যই কুরিয়ার-কিলারও ওর ঠিকানা বের করে ফেলেছে। ঠিক করে ফেলল, সকালেই যোগাযোগ করবে বিএসএস কন্ট্যাক্টের সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা সেরে যদি কাজ এগোয় তা হলে মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে আলাপ আছে ওর। ও কোথায় আছে সেটা এম আই ফাইভ কীভাবে জানল সেটা জানা দরকার। মার্ভিন লংফেলোকে জানাতে হবে এম আই ফাইভ তাদের একজন কম্পিউটার অপারেটরকে টপ সিক্রেট বিষয়েও অ্যাক্সেস দিয়ে বসে আছে।

নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, সামান্থা সম্পর্কে ভালমত খোঁজ নিতে হবে। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছে, জন লেইটারের মেয়ের মাথায় কোনও গোলমাল নেই তো?

টাব থেকে উঠে গা মুছে একটা রোব পরে নিল রানা, ওয়ালথারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। জ্যাকেটের কাছে চলে এসে ওটা থেকে বের করে নিল সাদা খামটা, উল্টে দেখল। প্রেরকের নাম অ্যান্থনি লেমঁ। ঠিকানাটা প্যারিসের। বিছানায় বসে খাম খুলে চিঠিটা বের করল ও। ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। ভাষাটা ফ্রেঞ্চ, তবে আঞ্চলিক। শুধু অলিভার আর অ্যান্থনি লেমঁ শব্দ দুটো পড়তে পারল রানা, চিঠির বাকি অংশ ওর কাছে হায়ারোগ্লিফিক্সের মতোই দুর্বোধ্য।

কাপড়চোপড় পড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা, রাস্তার মোড়ের একটা পে বুদ থেকে টেলিফোন করল বিএসএস চিফ মার্ভিন লংফেলোকে। কুশল বিনিময়ের পর কাজের কথা তুলল ও। 'আপনাকে আমি জন লেইটারের মেয়ের কথা বলেছিলাম। লন্ডনে হোটেলে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটা তো আমার পিছু ছাড়ছে না। গ্লাসগোতেও আমাকে অনুসরণ করে চলে এসেছে।'

'অথচ তুমি জানতে না তোমাকে অনুসরণ করছে?'

সরাসরি জবাব দিল না রানা। 'আমাকে বলেছে এম আই ফাইভের কম্পিউটার থেকে তথ্য পাচ্ছে সে। খোঁজ নেয়া দরকার আমার ব্যাপারে এম আই ফাইভ জানে কী করে।'

'খোঁজ তো অবশ্যই নেব,' বললেন লংফেলো। 'আমি ওদের কিছু জানাইনি।'

'এখানে আমার ওপর তিনটে গুলি করা হয়েছে,' সহজ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ডক্টর হপকিন্সের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে।' লংফেলো কিছু বলছেন না দেখে জানাল শেষটুকু, 'ওখান থেকে বেরিয়ে দেখলাম লোকটা মরে পড়ে আছে রাস্তায়।'

'আচ্ছা, এ ব্যাপারেও খোঁজ নেব।'

'শুধু এই ব্যাপারটাই নয়,' বলল রানা। 'এই মেয়েটি সত্যি জন লেইটারের মেয়ে কিনা তা-ও খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। সম্ভব হলে তার একটা ফটো চাই আমি।'

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।' যোগাযোগ কেটে দিলেন লংফেলো।

পরদিন সকাল। পুরো আট ঘণ্টা গভীর ঘুম দিয়ে উঠে তরতাজা বোধ করছে রানা, ফ্রেশ। ইন্টারকমে রুম সার্ভিসকে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল ও। হাত-মুখ ধুয়ে এসে ফোন করল বিএসএস-এর ওয়াচারের কোডেড নম্বরে। অ্যান্সারিং মেশিনে মেসেজ দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

কাল রাতে বিএসএস চিফ মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে রানার।

ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় রিং হলো।

'রুম এমআরনাইন?' কাল রাতের সেই চিকন পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল।

'ঠিকই ধরেছেন এবার,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

টিটকারিটা বুঝে থাকলেও উপেক্ষা করল বিএসএস ওয়াচার। 'আমাদের লোক পায়নি এমন কিছু পেয়েছেন ডক্টরের ওখানে আপনি?' খানিকটা বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' শান্ত সুরে জানাল রানা। 'আরেকটা কথা, কোথায় গিয়েছিলাম সেটা ফোনে উল্লেখ করার দরকার নেই।'

'পেয়েছেন?' বেসুরো হয়ে গেল ওয়াচারের কণ্ঠ। খানিকটা বিস্ময় মেশানো হতাশাও প্রকাশ পেল।

'এমন কাউকে দরকার যে আঞ্চলিক ফ্রেঞ্চ জানে,' বলল রানা। 'আপনার পরিচিত কেউ আছে?'

'আছে।'

'তাকে পাঠাতে পারবেন?'

'যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে চেষ্টা করব।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'অসম্ভব! আমি...'

'ঠিক এক ঘণ্টা,' আবার বলল রানা। 'তারপর আমাকে এই ঠিকানায় পাবেন না।'

'বেশ। চেষ্টা করা হবে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'শালা গাধা।' সুটকেস

গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। পঞ্চান্ন মিনিট পর আবার বেজে উঠল ফোন। ধরল রানা।

'রুম এমআরনাইন, আমাদের লোক কোথায় আসবে?'

'লবিতে।'

'লবি? আপনার ঘরে নয় কেন?'

'চেক-আউট করছি আমি।' হোটেল ডেস্কে যোগাযোগ করে বিল তৈরি করতে বলেছে রানা আগেরবার ফোন রাখার পরপরই। 'লবিতে পাঠান। আপনার লোক বাদামি একটা সুটকেস সহ আমাকে পাবে ওখানে।'

'ঠিক আছে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

ফোন রেখে সুটকেস নিয়ে লবিতে নেমে এলো রানা, বিল মিটিয়ে দিয়ে সোফায় বসে মনে মনে আশা করল সামান্থা লেইটারের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে না। ধীরে ধীরে কেটে গেল চল্লিশ মিনিট। লবির প্রবেশ পথ আর এলিভেটরের দিকে চোখ রেখেছে রানা। এক কৃষ্ণকেশীকে ঢুকতে দেখে ভাবল এই মেয়েটা ওর ভাষান্তরকারিণী হলে মন্দ হয় না। কিন্তু মেয়েটা ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ক্লার্ককে কী যেন বলল, তারপর বেরিয়ে গেল আবার।

ঊনষাট মিনিটের মাথায় পুরু কাঁচের চশমা পরা মাঝারী আকৃতির এক মাঝবয়সী লোক ঢুকল লবিতে। চারপাশে তাকাল সে থেমে দাঁড়িয়ে, তারপর রানার পাশে রাখা বাদামি সুটকেসটা দেখে এগিয়ে এলো।

'এই সুটকেসটা কি আপনার?' কাছে এসে নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলুন।'

'কোথায়?' লোকটার প্যাঁচার মতো চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়ল।

'গেলেই দেখতে পাবেন,' সুটকেসটা তুলে নিল রানা। 'চলুন।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, ডোরম্যানকে বলে একটা ট্যাক্সি আনাল রানা। পেছনের সিটে উঠল ও অনিচ্ছুক চেহারার ভাষান্তরকারীকে নিয়ে, তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান।'

'আপনি যা বলেন, সার।' গিয়ার দিয়ে এগোল ড্রাইভার। মিটার যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ আরোহী যদি সারাদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরে তাতেও তার কোনও আপত্তি নেই, বরং খুশিই হবে সে।

'কী মানে এসবের?' অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল প্যাঁচা।

'কাজটা কোথায় করা হচ্ছে সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়, যতক্ষণ কাজটা ঠিক মতো করা হচ্ছে,' জ্ঞান দানের সুরে বলল রানা, গম্ভীর। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'এখানে কী লেখা আছে সেটা আমাকে জানান।'

'আমি এর মানে বুঝছি না,' চিঠিটা না নিয়ে অভিযোগের সুরে বলল ভাষান্তরকারী। 'এধরনের পরিবেশে কাজ করতে রাজি নই আমি।'

যেচে পড়ে কাজটা হাতে নেওয়ার পর থেকেই কেন জানি ভাল লাগছে না

রানার। প্রথমে ওয়াচারের আচরণে মনে হয়েছে লোকটা অদক্ষ এবং বেয়াক্কেলে, তারপর হাজির হলো সামান্থা লেইটার, বলল এম আই ফাইভ জানে ও কোথায় কী করছে। এখন এই প্যাঁচাটা ঘাড়ত্যাড়ামি শুরু করেছে। কাঁধ আর হাঁটুর ব্যথাটাও ভোগাচ্ছে ওকে। রাগ সামলে ঠাণ্ডা কণ্ঠে ও বলল, 'দেখুন, আপনি চিঠিটা পড়বেন বলে কোনও পাঁচতারা হোটেলে আপনাকে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়াতে পারব না আমি, দুঃখিত। তবে হাতে একদম সময় নেই আমার। চিঠিটা পড়ে ওটাতে কী লেখা আছে তার সারসংক্ষেপ লিখে দিন আমাকে, তা না হলে এমন প্যাঁদানি দেব যে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবেন।'

'এত সাহস আপনার হবে না। কালুয়া একজন লোক হয়ে... ফোঁস করে উঠল লোকটা।

'আমার মনে হচ্ছে প্যাঁদানি লাগবে না, যা বললেন তা-ই করবেন উনি,' রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে রানার চেহারা দেখে বিজ্ঞ মন্তব্য করল ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ,' তাকে বলল রানা, তারপর তাকাল ভাষান্তরকারীর দিকে। 'কী?'

'ঠিক আছে,' লেখালেখির ঝামেলায় না গিয়ে, ড্রাইভারের সামনেই, জোরে জোরে পড়তে শুরু করল লোকটা: 'প্রিয় অলিভার, কবে ও কখন আসছ সেটা জেনেছি। যেমন বলেছ তেমনই করেছি, কাউকে কিছু জানাইনি। আশা করছি এখানে পৌঁছে জানাবে কী সমস্যা হয়েছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকলাম–অ্যান্থনি লেমঁ।'

'আর কিছু?'

'না।' কাগজটা ফিরিয়ে দিল সে রানাকে। 'মানে কী এর?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।' চিঠিটা পকেটে রেখে দিল রানা। এবার ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিল। 'এঁকে কোথাও নামিয়ে দিন।'

'আমার সঙ্গে এরকম করাটা আপনার অন্যায় হচ্ছে,' ঝগড়াটে মোরগের মতো ঘাড় সিধে করল প্যাঁচা।

'হচ্ছে না,' বলল রানা। গুড়গুড় করে উঠল ওর গলা। 'আশা করি পথ চিনে ফিরতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।'

রাস্তার ধারে থেমে পড়েছে ট্যাক্সি। ঝুঁকে পড়ে ওদিকের দরজাটা খুলে দিল রানা। 'সাহায্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

রানার চেহারা দেখে চট্ করে নেমে পড়ল লোকটা, তাড়াহুড়োর ভাব দেখে মনে হলো রানা আর নিজের মাঝে যতটা দ্রুত পারা যায় দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে।

'চলুন,' ড্রাইভারকে বলল রানা। মেজাজটা খানিক ঠাণ্ডা হয়েছে ওর।

'কোথায়, সার?'

'প্যারিস।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, সার!'

'তা হলে এয়ারপোর্ট। ওখান থেকে বাকি পথ আমি একাই যেতে পারব।'

সাত

অর্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির দিকে এগোল রানা। চতুর্থ ট্যাক্সিটা পেল ও। ড্রাইভারকে বলল খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরতে, প্রথমেই প্যারিসের ট্রাফিক একটু দেখে নিতে চায়।

'আপনার যা ইচ্ছে, মসিয়ো,' বলল ড্রাইভার। ধরে নিয়েছে এ-ও এক ছিটেল টুরিস্ট।

কিছুক্ষণ পর রানা নিশ্চিত হলো এয়ারপোর্ট থেকে ওর পিছু নেয়া হয়নি। ছোট একটা হোটেলের ঠিকানা ড্রাইভারকে জানাল ও। ওখানে আগেও থেকেছে

'ঠিক জায়গাতেই উঠছেন, মসিয়ো,' বলল ড্রাইভার। 'হোটেলটা আমি চিনি দারুণ খাবার তৈরি করে ওরা।'

হোটেলে পৌঁছে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাল বকশিশ দিল রানা, সুটকেসটা তুলে নিয়ে চলে এলো লবিতে। ডেস্ক ক্লার্ক একই সঙ্গে হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারও। রানাকে দেখে চেহারা ঝলমল করে উঠল তার।

'মসিয়ো হিরাম! কী সৌভাগ্য আমাদের!' রেজিস্টার খাতাটা ডেস্কের ওপর তুলল সে।

এই হোটেলে রানা রবার্ট হিরাম নামেই ওঠে সবসময়। তবে সেটা শুধুই অবসর কাটাতে।

'হ্যালো, মসিয়ো ফোঁচ।'

'কদিন থাকছেন এবার, মসিয়ো হিরাম?'

'জানি না, মসিয়ো ফোঁচ।' ম্যানেজার রেজিস্টার বাড়িয়ে দেয়ায় সই করল রানা।

'কতদিন থাকবেন তা কখনোই আপনি আগে থেকে বলতে পারেন না, মসিয়ো।' হাসল ফোঁচ।

চাবিটা নিল রানা, মসিয়ো ফোঁচের উদ্দেশে হাত নেড়ে সুটকেসটা তুলে নিয়ে দোতলায় ওর কামরায় চলে এলো। একটু পর ইন্টারকম করল ওখান থেকে ডেস্কে। 'কফি পাঠাতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই! আর কিছু লাগবে, মসিয়ো?'

'বিস্কিট পাঠাতে পারেন কয়েকটা।'

'ভেরি ওয়েল, মসিয়ো, পৌঁছে যাবে এক্ষুনি।'

ইন্টারকম রেখে সুটকেস খুলে কাপড়চোপড় বের করবে কি না একবার ভাবল রানা, তারপর সুটকেস না খোলারই সিদ্ধান্ত নিল। কখন চলে যেতে হয় তার কোনও ঠিক নেই। পালাতে হলে হাতে কতটুকু সময় থাকবে জানা নেই, কাজেই আপাতত সুটকেস গোছানোই থাক।

একটু পরেই কফি আর রানার পছন্দের বিস্কিট নিয়ে হাজির হলো স্বয়ং

ফোঁচ। রানাকে কয়েকবার করে বলল, ও তাদের হোটেলে ওঠায় কতটা খুশি হয়েছে সে। ফোঁচ চলে যাবার পর কফি আর বিস্কিট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। দুটোই স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়।

খাওয়া সেরে নিয়ে ডক্টর হপকিন্সের চিঠিটা পকেট থেকে বের করে প্রেরকের ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। নীচে নেমে রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল হাত নেড়ে। ড্রাইভারকে ঠিকানা জানিয়ে উঠে বসল পেছনের সিটে।

দশ মিনিটও লাগল না, নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো রানা দোতলা বাড়িটার সদর দরজায়। দরজার কাছেই মেইলবক্সের পাশে কলিং বেল দেখতে পেয়ে বাজাল।

দরজা কে খুলবে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বিজ্ঞানী স্বয়ং? কোনও বুড়ো কেয়ারটেকার? অবাক হতে হলো ওকে। কৃষ্ণকেশী এক সুন্দরী খুলল দরজা, আপাদমস্তক দেখল রানাকে, তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল ও কী চায়।

নিজের সেরা হাসিটা উপহার দিল রানা। "অ্যান্থনি লেমঁ কি এখানে থাকেন?"

"আপনি বিদেশী।" প্রশ্ন নয়, মন্তব্য।

"হ্যাঁ।"

"বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি। আমি অ্যান্থনি লেমঁর মেয়ে।" একদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে, কিন্তু মোহিত হচ্ছে না।

"অ্যান্থনি লেমঁ বাড়িতে আছেন?"

"না। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করেছি আমি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি কি না।

"আসলে ওঁর কাছেই দরকার ছিল আমার।"

"সেক্ষেত্রে..." দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে মেয়েটা।

"একটা কথা..." হাত দিয়ে দরজাটা ধরে ফেলল রানা।

প্রথমে চোখ সরু করে রানার হাতটা দেখল মেয়েটা, তারপর ওর চোখের দিকে তাকাল। "বলুন?"

"উনি কখন ফিরবেন?"

"হয়তো বিকেলে।"

"হয়তো?" রানা আশা করল মেয়েটা একটু ভেঙে বলবে।

"হ্যাঁ, হয়তো। গুড বাই, মসিয়ো।"

"গুড..." রানার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, "বাই!"

অপূর্ব সুন্দরী হতে পারে মেয়েটা, তবে ব্যবহার ভাল নয়, ভাবল রানা—সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কোনদিন বিয়ে করবে না ওকে। মেয়েটা এমন কী ওর নামও জানতে চায়নি।

এমন কি হতে পারে নাম জিজ্ঞেস করেনি, কারণ কেউ না কেউ যে আসবে এবং লেমঁকে খুঁজবে সেটা আগেই জানে? হয়তো বাড়িতেই আছেন ভদ্রলোক?

মেয়েকে বলে দিয়েছেন কেউ খুঁজতে এলে বলে দিতে হবে তিনি বাড়ি নেই?

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখানে ও আবার আসবে। এবং সে-সময় কলিং বেল বাজাবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে পে বুদ থেকে লন্ডনে টেলিফোন করল রানা। প্রথমবার রিঙ হতেই সাড়া দিলেন বিএসএস চিফ। 'হ্যালো?'

'রানা, মিস্টার লংফেলো। সামান্থার ব্যাপারটা জানার জন্যে ফোন করেছি।'

'কয়েকটা তথ্য দিই, দেখো মেলে কিনা,' বললেন লংফেলো। 'এম আই ফাইভে চাকরি করে সে। হ্যাঁ, কমপিউটার অপারেটরই। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে খুবই সুন্দরী। স্বাধীনচেতা, প্রাণচঞ্চল টাইপের মেয়ে, চরিত্রে একটু নাটুকেপনাও আছে। কলিগরা কেউ কেউ তাকে আধপাগলা বলে। শেষদিকে বেশ কিছুদিন বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না, কারণটা কেউ বলতে পারছে না। জন লেইটার খুন হবার পর অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে, কলিগদের জানিয়েছে, বাবার খুনিদের ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারলে চাকরিতে আর ফিরবে না। আমরা যে তার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি, এম আই ফাইভকে জানানো হচ্ছে না সেটা। ফটো যোগাড়ের চেষ্টা চলছে।'

'তা হলে বোধহয় সব ঠিকই আছে,' বলল রানা। 'দৈহিক বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে মন কষাকষির ব্যাপারটা নিজেই জানিয়েছে আমাকে। খুব ছটফটেও। মানুষকে চমকে দেবার প্রবণতা আছে...'

লংফেলো হেসে ফেললেন। 'তা হলে আর সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই যে জন লেইটারের সেই আধপাগলা মেয়েই আমাদের এই সামান্থা।'

আট

হোটেলের লবিতে ঢুকতেই রানাকে দেখে চার ইঞ্চি চওড়া একটা হাসি উপহার দিল মসিয়ো ফোঁচ। 'মসিয়ো, সকালটা ভাল কেটেছে তো?'

'খুব একটা না!' কৌতূহল নিয়ে ফোঁচকে দেখল রানা। 'কোথাও কোনও সমস্যা?'

'না, মসিয়ো,' হাসিটা আরও চওড়া হলো ফোঁচের। 'সব ঠিক আছে। সকালটা ভাল না কাটলেও আশা করি শীঘ্রি আপনার মন ভাল হয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। ব্যাপারটা কী? ফোঁচ এত হাসছে কেন? আপনমনে মাথা নেড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পুরো মাত্রায় কাজ করতে শুরু করেছে। ওর ঘরে কেউ এসেছে, ফোঁচ ওকে চমকে দিতে চায়? দরজার সামনে থেমে ওয়ালথারটা বের করল রানা, আরেক হাতে তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। ক্ষণিকের জন্য থমকে যেতে হলো ওকে।

'অবাক হবার কিছু নেই,' বলল সামান্থা। বিছানায় বসে আছে সে।

পিছনে দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা কফি টেবিলের ওপর রাখল রানা। শীতল

শোনাল ওর কণ্ঠ: 'সামান্থা, জানতে পারি এখানে তুমি কি করছ?'

'সঙ্গ দিতে এলাম।'

কীভাবে এখানে এই হোটেলে ওর ঘরে এসে হাজির হলো মেয়েটা, ভাবল রানা। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। ট্রেনিং নেই এমন একটা মেয়ে প্রতি পদক্ষেপে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। কীভাবে সম্ভব?

'আবার এম আই ফাইভের কম্পিউটার ট্যাপ করেছ?'

'বিজনেস সিক্রেট।' মুখ টিপে হাসল সামান্থা।

জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা। টাই খুলতে খুলতে বলল, 'আমার পিছু নিয়ে তোমার কোনও লাভ হবে না, সামান্থা। অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি আমাকে অনুসরণ করে।'

'মোটেই সময় নষ্ট করছি না,' বলে মাথা নাড়ল সামান্থা। 'আমি দেখতে চাই আমার বাবার খুনিরা ধরা পড়েছে, কিংবা এক এক করে মারা পড়ছে তোমার হাতে।'

'তার আগেই হয়তো ওদের কারও হাতে খুন হয়ে যাবে তুমি,' একটা চেয়ার টেনে বসল রানা, যাতে বিছানায় মেয়েটার পাশে বসতে না হয়। 'মারাত্মক কোনও বিপদে পড়ে যাবার আগেই ফিরে যাওয়া উচিত তোমার।'

'তুমি ভাবছ আমি আনাড়ি-অনভিজ্ঞ, একেবারে কিছুই জানি না এসপিয়োনাজের?'

'ঠিক ধরেছ।'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না যে তোমার পেছনে লেগে থাকতে পারছি আমি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আর এবার লন্ডনে বসে এম আই ফাইভের কম্পিউটার ব্যবহারের কোনও সুযোগ ছিল না সামান্থার। এম আই ফাইভের কোনও কন্ট্যাক্ট, নাকি কোনও সাইবার ক্যাফে থেকে গোপন কোড ব্যবহার করে এম আই ফাইভের কম্পিউটার ব্যবহার করেছে মেয়েটা? এম আই ফাইভের মধ্যেও হয়তো আছে বিশ্বাসঘাতক। সে-সম্ভাবনাই বেশি। এম আই ফাইভ বিএসএস-এর ওপর দিয়ে টেক্কা মারছে, আর তাদের সংগৃহীত তথ্য কাজে লাগাচ্ছে বিশ্বাসঘাতক।

রানাকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে সামান্থা বলল, 'তুমি চাইলে আমি চলে যেতে পারি। তবে মনে রেখো, আশপাশেই থাকব আমি।'

'এক্ষুনি তোমাকে আমি চলে যেতে বলছি না,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

'চলে যেতে বলছ না?' একটু অবাক হলো সামান্থা।

'না। তুমিই ঠিক বলেছ, একসঙ্গে কাজ করলে হয়তো একা কাজ করার চেয়ে ভাল ফল হবে।'

'সত্যি তুমি তা-ই মনে করো?' উত্তেজনায় মেরুদণ্ড সোজা করে বসল মেয়েটা।

'হ্যাঁ।' রানা বলল না আসলে ও চাইছে সামান্থা ওর ধারে-কাছে থাকুক, যাতে ও তার ওপর নজর রাখতে পারে। একা একা থাকলে কখন কী বিপদে

পড়বে কে জানে! 'ডেস্কে ফোন করছি আমি, দেখি তোমার জন্যে ওরা একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে কি না।'

'আমি না হয় এ-ঘরেই থাকি? তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না।' ইন্টারকম করল রানা ডেস্কে, ফোঁচকে জিজ্ঞেস করল একটা সিঙ্গেল রুম পাওয়া যাবে কি না।

'সত্যিই আমি দুঃখিত, মসিয়ো,' জানাল ফোঁচ। 'তবে আজ কোনও ঘর খালি পাওয়া যাবে না।'

'কাল সকালে?'

'সকালে একটা ঘর দিতে পারব।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আমার অতিথির জন্যে একটা ঘর রিযার্ভ করে রাখুন।'

'নিশ্চয়ই, মসিয়ো হিরাম,' বলল ফোঁচ। 'আশা করি রাতটা আপনার অত্যন্ত চমৎকার কাটবে।'

মনের চোখে ফোঁচের আমুদে, চওড়া হাসি দেখতে পেল রানা। শান্ত স্বরে ও বলল, 'ধন্যবাদ, মসিয়ো ফোঁচ।'

'আমি তা হলে সুন্দরী ভদ্রমহিলার লাগেজ আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' জানাল ফোঁচ।

রানা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।'

ইন্টারকম রেখে সামান্থার দিকে ফিরল রানা। 'এবার আমার ঘরে ঢুকেছ কেমন করে?'

'কঠিন হয়নি।' হাসল সামান্থা। 'আমি ডেস্কের লোকটাকে বলেছি আমরা খুব ঘনিষ্ঠ, মানে, বন্ধু আমরা। ওই ফোঁচ না মোচ কী যেন লোকটার নাম, সে খুশি মনে আমাকে এ-ঘরের চাবি দিয়ে দিল, যাতে তোমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করতে পারি। ভেবেছে চমকটা পছন্দ করবে তুমি।'

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেই চাবি দিয়ে দিল?' গলার আওয়াজই বলে দিল কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না রানা।

হেসে ফেলল সামান্থা। 'ভাবছিলাম কখন প্রশ্নটা করবে তুমি। শুধু বন্ধু বলায় কাজ হয়নি, তোমার নামও বলতে হয়েছে।'

'কী নাম?'

'রবার্ট হিরাম।'

'তুমি এই নাম জানলে কোত্থেকে?' রানা অবাক।

মাথা নাড়ল সামান্থা। 'বলব না! বিজনেস সিক্রেট।' সকৌতুক হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। তোমার ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই লোক কি এখানে উঠেছে? মোচ না ফোঁচ বলল, কে, মসিয়ো রবার্ট হিরাম? উত্তরে আমি শুধু এক গাল হাসলাম।'

'তুমি আমার ছবি পেলে কোথায়?'

'উফ্, এত জেরা করলে স্রেফ মারা পড়ব আমি!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত

দুটো খানিকটা তুলল সামান্থা। 'আরে বাবা, তোমার ছবি কোথাও আমি পাইনি– এঁকেছি, বুঝলে?'

নয়

কাপড় পাল্টে আসার পর সামান্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানাকে।

'তোমাকে দেখতে ঠিক ডাকাতের মতো লাগছে। এখন সাদা মোজা পরলে অবশ্য ক্লাউন মনে হবে।'

রানার পরনে কালো একটা টার্টলনেক সোয়েটার, তার ওপর কালো একটা উইন্ডব্রেকার চাপিয়েছে ও। সেই সঙ্গে কালো প্যান্ট, কালো শ্যু।

'ডাকাত নই তা তোমাকে কে বলল!' ওয়ালথারটা বের করে ট্রিগার মেকানিযম পরখ করে দেখল রানা, ম্যাগাযিন ভরা আছে দেখে নিয়ে রেখে দিল ওটা হোলস্টারে। খেয়াল করেছে পিস্তলটা দেখে সামান্থা খানিকটা নার্ভাস ভাবে তাকিয়ে ছিল। 'পিস্তল পছন্দ করো না তুমি?'

'পিস্তলের মত একটা জিনিসকে পছন্দ করতে হবে কেন?'

''না, তা নয়,' বলল রানা। 'তবে পিস্তলের ব্যবহার জানা থাকলে খানিকটা বাড়তি সুবিধে পাবে তুমি।'

'তোমার কাছে তো আছেই,' বলল সামান্থা। 'আমি তোমার ওপরেই ভরসা করছি।...এবার বলবে?'

'কী বলব?'

'কোথায় যাচ্ছ।'

'বাইরে।'

'আমরা বিবাহিত নই, রানা।'

'মানে?'

'ওরকম করে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে বিবাহিত পুরুষ, যখন তারা অন্য মেয়ের কাছে যায়।'

মৃদু হাসল রানা। 'আচ্ছা! তো এটা কি তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললে?'

'এড়িয়ে যেয়ো না। আসলেই কি কোনও মেয়ের কাছে যাচ্ছ?'

'আমরা কি বিবাহিত?' এবার রানাই হেঁয়ালি করল।

'না।'

'তা হলে তোমার কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না, কী বলো? শীঘ্রি ফিরব, দরজাটা বন্ধ রেখো।'

পিছন থেকে সামান্থা বলল, 'ফেরার সময় কিছু খাবার নিয়ে এসো। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর সঙ্গে যা পাও!'

রুম সার্ভিসকে জানাও বলতে গিয়েও বলল না রানা, আরেকবার দরজা বন্ধ

রাখতে বলে বেরিয়ে এলো সুইট ছেড়ে।

লবি পার হবার সময় মসিয়ো ফোঁচের চওড়া হাসি দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল ও। বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল, ড্রাইভারকে অ্যান্থনি লেমঁর ঠিকানা জানিয়ে আয়েশ করে বসল পিছনের সিটে। বাড়িটা এক ব্লক দূরে থাকতেই বলল, 'ব্যস, এখানেই।'

'যিস্ ইস্ নত...' ভয়ঙ্কর ইংরেজিতে বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু ড্রাইভারকে থামিয়ে দিল রানা।

'এখানে নামালেই চলবে।' ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। ট্যাক্সিটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর হাঁটার গতি দ্রুত হলো ওর। রানা জানে, যতবারই ও কলিং বেল বাজাক না কেন, অ্যান্থনি লেমঁর মেয়ে বলবে তার বাবা বাড়ি নেই। কাজেই বেল বাজানো অর্থহীন। বাগানে ঢুকে পড়ল ও সামনের নিচু সাদা বেড়াটা পার হয়ে, তারপর বাড়ির পিছনের দরজায় গিয়ে কাজে লাগাল লকপিক।

দরজাটা খুলতে এক মিনিটও লাগল না। সামনেই অন্ধকার করিডর। একটা খোলা দরজা থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে করিডরের একাংশ দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছে। নিঃশব্দে ওই দরজাটার দিকে এগোল রানা। ভেতরে দু'জন কথা বলছে। তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু কথার মানে বুঝতে পারছে না। খুব নিচু গলায় দ্রুত ফ্রেঞ্চ বলছে তারা। একটা কণ্ঠ মেয়ের।

ঘরের দু'জন যাতে চমকে না যায় তা-ই দরজার কাছে পৌঁছে সামান্য আওয়াজ করল রানা, পরক্ষণেই ঢুকল ঘরে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে অ্যান্থনি লেমঁর মেয়ে, রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। রানার আকস্মিক অনুপ্রবেশে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আরেকজন, এক মাঝবয়সী লোক। হেলান দিয়ে একটা আরামকেদারায় বসে আছেন তিনি।

'মসিয়ো লেমঁ?' তাঁর দিকে মনোযোগ দিল রানা।

'আরেহ্, আপনি!' মেয়েটা রানাকে চিনতে পেরেছে।

'হ্যাঁ, সেই আমিই আবার এলাম,' অনাবিল হাসল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে কড়া চোখে রানাকে দেখল মেয়েটা। 'ঢুকলেন কী করে?'

'পেছনের দরজা দিয়ে। চিন্তার কিছু নেই, তালাটা ঠিকই আছে।'

মাঝবয়সী লোকটার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'পাপা, এই লোকের কথাই তোমাকে বলেছিলাম, আজই একবার তোমাকে খুঁজে গেছে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন অ্যান্থনি লেমঁ, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন খুঁজছেন আমাকে?'

'আপনি জানেন কেন আমি আপনাকে খুঁজছি, মসিয়ো লেমঁ,' বলল রানা। 'আমার ধারণা আপনারা দু'জনই জানেন। এবং সেজন্যেই আপনার মেয়ে আমাকে মিথ্যে বলেছিল।'

'আমি মোটেই...'

'লায়লা,' ক্লান্ত স্বরে বললেন লেমঁ। বাবার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল

লায়লা লেমঁ।

'বলুন কী চান,' রানার দিকে তাকালেন লেমঁ।

'অলিভার হপকিন্সকে খুঁজছি আমি,' বলল রানা।

'ওই নামের কাউকে আমি চিনি না,' চোখের পলক পড়ল না লেমঁর।

'চেনেন ভাল করেই।'

'একবার তো বললাম আমি...

পকেটে হাত ভরে ভদ্রলোকের দিকে এগোল রানা। লায়লা লেমঁর চেহারায় আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। অ্যান্থনি লেমঁ চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। দুজনের ভাব দেখে মনে হলো আশঙ্কা করছে এখনই রানা পকেট থেকে পিস্তল বের করবে। ভাঁজ করা একটা সাদা এনভেলাপ বের হলো ওর পকেট থেকে, ওটা ভদ্রলোকের কোলের ওপর ফেলে সামান্য পিছিয়ে দাঁড়াল রানা।

'কী এটা?'

'ডক্টর হপকিন্সকে পাঠানো আপনার চিঠি। চিঠিটা পৌঁছনোর আগেই ডক্টর হপকিন্স সম্ভবত ইংল্যান্ড ছাড়েন। তাঁর মেইলবক্সে এটা পেয়েছি আমি।'

চিঠির ভাঁজ খুলে ওটা যে আসল সেটা দেখলেন লেমঁ। পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন চিঠি-এনভেলাপ।

'আপনি কে?'

সরাসরি জবাব দিল না রানা। 'আমার কাছে একটা জিনিস আছে, ডক্টর হপকিন্সকে সেটা পৌঁছে দেবার-কথা। কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ডক্টর, কাজেই তাঁকে খুঁজে বের করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'কী দেবেন, একটা বুলেট?' ত্যাড়া সুরে জিজ্ঞেস করল অ্যান্থনি লেমঁর মেয়ে।

'না।'

'তা হলে?'

'লায়লা!' আগের চেয়ে কড়া শোনাল লেমঁর কণ্ঠ।

'সেটা কী তা বলা যাবে না,' বলল রানা। অ্যান্থনি লেমঁর দিকে তাকাল। 'আপনি তো জানেন ডক্টর হপকিন্স কী ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।'

'জানি না,' বললেন লেমঁ। 'তবে এটা জানি যে বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়।'

'তাঁর ওই গবেষণার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস আমি পৌঁছে দিতে এসেছি,' বলল রানা। 'আমাকে আপনার বিশ্বাস করতে হবে।'

'অত প্রয়োজনীয়ই যদি হবে তা হলে উনি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল লায়লা লেমঁ।

অ্যান্থনি লেমঁর দিকে তাকাল রানা। ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন, বুঝিয়ে দিলেন মেয়ের মুখ বন্ধ করতে সাধ্য মতো করেছেন তিনি।

লায়লা লেমঁর দিকে ফিরল রানা। 'মিস লেমঁ, আপনাকে আমি এটুকু বলতে পারি যে ডক্টর হপকিন্স আমার কাছ থেকে পালাচ্ছেন না।'

'তা হলে কার কাছ থেকে পালাচ্ছেন?'

খানিকটা তথ্য দেবে ঠিক করল রানা। বুঝতে পারছে মেয়েটা যদি না থাকত তা হলে এতক্ষণে অ্যান্থনি লেমঁকে প্রভাবিত করে ফেলতে পারত ও। লায়লা লেমঁকে আগে সামলাতে হবে।

'দুটো কাজে এসেছি আমি এখানে, মিস লেমঁ,' বলল রানা। 'এক, ডক্টর হপকিন্সকে খুঁজে বের করে জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়া। দুই, যাদের কাছ থেকে তিনি পালাচ্ছেন তাদের মুখোমুখি হলে তাঁকে ও নিজেকে রক্ষা করা। তার মানেই হচ্ছে তাদেরকে আমার খুন করতে হতে পারে। খুন হয়ে যেতে পারি আমি নিজেও। এবার বলবেন, ডক্টর হপকিন্স কোথায়?'

'এখানে নেই,' বললেন অ্যান্থনি লেমঁ।

'কিন্তু এখানেই তো তাঁর থাকার কথা।' খানিকটা হতাশা অনুভব করল রানা।

'পাপা...'

'লায়লা, আর একটা কথাও নয়,' ধমক দিলেন লেমঁ। রানার দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, অলিভার এখানে ছিল। কিন্তু দু'দিন আগে চলে যায়।'

তার মানে চিঠিটা যেদিন পৌঁছায় সেদিনই ফ্রান্সে আসেন ডক্টর হপকিন্স, আগেই রওনা হয়ে যাওয়ায় চিঠিটা পাননি। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেন চলে যান উনি?'

'ভয় পাচ্ছিল এখানে ও আর নিরাপদ নয়।'

'উনি ভাবছিলেন এ-বাড়ির আশপাশে তাঁকে কিডন্যাপ করতে চায় এমন লোকজন ঘোরাঘুরি করছে,' বলল লায়লা লেমঁ। 'খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।'

'সত্যিই কি সন্দেহজনক কাউকে এ-বাড়ির ধারেকাছে দেখা গেছে?'

'আমাদের চোখে পড়েনি কেউ,' বললেন লেমঁ। 'তবে অলিভার ভয় পাচ্ছিল এখানে থাকলে খুন হয়ে যাবে ও।'

ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা। বিজ্ঞানীর মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছে। ভদ্রলোক এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে বিনা কারণেই সন্দেহ হতে পারে তাঁর। কেউ খুন করতে চায় এটা স্বস্তিকর চিন্তা নয় মোটেই। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে উনি কোথায় গেছেন সেটা আপনাদের বলে যাননি?'

'না। ও চায়নি কেউ জানুক।'

'উনি যে-ঘরে ছিলেন সেটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' মেয়ের দিকে তাকালেন অ্যান্থনি। 'লায়লা আপনাকে নিয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ধন্যবাদ, মসিয়ো লেমঁ।'

'আসুন আমার সঙ্গে।' রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লায়লা লেমঁ, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মনে হলো রানা অনুসরণ করছে কি করছে না তাতে তার কিছু যায় আসে না।

তার পিছু নিয়ে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো রানা। ছোট কিন্তু সাজানো গোছানো একটা বেডরুমের দরজা খুলল লায়লা। 'গেস্ট রুম।'

এক পাশে সরে দাঁড়াল সে।

ভিতরে ঢুকল রানা। 'সুটকেস খুলেছিলেন উনি?'

'জানি না। আমি ওঁর ঘরে আসিনি বা ড্রয়ার খুলে দেখতে যাইনি।'

একে একে ক্লজিট আর চেস্ট অভ ড্রয়ার্স খুলে দেখল রানা। ওগুলোতে নেই কিছু। কখনও ছিল কি না জানার কোনও উপায় নেই। বিছানার তলা খুঁজল ও, তোশক-বালিশ নেড়েচেড়ে দেখল। পাওয়া গেল না কোনও সূত্র।

'পেলেন কিছু?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল লায়লা।

'না।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল রানা। কোনও কিছু খুঁজতে বাদ রয়ে গেল কি না ভাবছে। আধ মিনিট পর বুঝতে পারল কী ওর চোখ এড়িয়ে গেছে।

ট্র্যাশ বাস্কেট খুঁজে দেখতে ঘরের দেয়াল লাগোয়া রাইটিং ডেস্কটার কাছে চলে গেল ও।

'ওখানে কী পাবেন আশা করছেন!' টিটকারির সুরে বলল লায়লা।

'তেমন কিছু না,' বাস্কেটে হাত ভরে দিল রানা। 'তবে যা পাই তা-ই নেব।'

পাঁচ বাই সাত ইঞ্চি একটা প্যাড পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আর বাস্কেটে পাওয়া গেল ওটারই কয়েকটা মোচড়ানো বল পাকানো কাগজ। ওগুলো বের করে পকেটে রাখল রানা। এবার রাইটিং প্যাডের দিকে মনোযোগ দিল। তুলে নিল ওটা ডেস্ক থেকে।

'এটা আমি নিতে পারি?'

'নিন, যদি সাদা কাগজ আপনার অতই পছন্দ হয়!'

প্যাড পকেটে রেখে লায়লার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, কৌতূহল বোধ করছে। 'আচ্ছা, বলুন তো, আপনি শুরু থেকেই আমার সঙ্গে এরকম রূঢ় আচরণ করছেন কেন?'

লায়লা লেমঁ মুখ কালো করে বলল, 'জানতে চাইছেন তাই বলছি, যারা আমার পাপার জীবনের ওপর হুমকি সৃষ্টি করে তাদের সবার প্রতি আমার রূঢ় আচরণ করা উচিত নয়? আমি চাইনি ডক্টর হপকিন্স এখানে এসে উঠুন। আমি এটাও চাই না আপনি এ-বাড়িতে আসুন।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল রানা, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

নীচে নেমে এলো দু'জন। আগের সেই চেয়ারেই বসে আছেন অ্যান্থনি লেমঁ। মনে হলো একটুও নড়াচড়া করেননি। বিদায় নেয়ার আগে রানা তাঁকে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মসিয়ো।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

রানা ঢুকেছে বাগান হয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে, বেরিয়ে যাবে সামনে দিয়ে। ওকে পাশ কাটিয়ে এগোল লায়লা লেমঁ, কামরার একটা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে, চোখ-মুখে রাজ্যের অসন্তোষ।

সেদিকে এগোচ্ছে রানা, হঠাৎ বন্ধ একটা জানালার সমস্ত কাঁচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। প্রায় একই সঙ্গে কড়াক করে একটা আওয়াজও হয়েছে, দরজা-

জানালা বন্ধ থাকায় পরিষ্কার শোনা যায়নি সেটা। শুধু জানালার কাঁচ নয়, ওটার উল্টোদিকের দেয়ালে ঝোলানো অয়েলপেইন্টিংটার কাঁচও চুরমার হয়ে গেছে, ফ্রেমসহ খসে পড়েছে মেঝেতে।

মূর্তির মত জমে গেছে লায়লা দরজার পাশে।

রানা রিয়্যাক্ট করল বিদ্যুৎবেগে। প্রথমেই ঝট করে ঘাড় ফেরাল ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে নিজের পিস্তল। দেখল আরামকেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন অ্যান্থনি লেমঁ, তাঁর হাতেও বেরিয়ে আসছে একটা পিস্তল—নাইন এমএম ল্যুগার।

'কী হলো?' কাঁচভাঙা জানালার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। পরমুহূর্তে দেখলেন বাঘের মত তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

তাকে নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও। এবার পরিষ্কার শোনা গেল বাইরে রাইফেল গর্জে ওঠার আওয়াজটা। দুজনের উপর দিয়ে ছুটে গেল দ্বিতীয় বুলেট, দাঁড়িয়ে থাকলে রানার পিঠে লাগত, আর রানা ওখানে না থাকলে লাগত লেমঁর বুকে।

লেমঁর পাশে পড়ল রানা, গড়ান দিয়ে সরে যাওয়ার সময় সাবধান করল, 'শুয়ে থাকুন, দাঁড়াবেন না!' লায়লার উদ্দেশে বলল, 'আপনিও দরজার আড়ালে থাকুন, নড়বেন না।' ঠিক এই সময় আরও দুটো গুলির আওয়াজ হলো। তবে রাইফেলের নয়, পিস্তলের। কামরার ভিতর কোনও বুলেট ঢুকল না।

হাঁটুর উপর উঁচু হয়ে জানালার কিনারা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। ছোট্ট একটা বাগানের পর রাস্তা। বাগানটা প্রায় অন্ধকার হলেও রাস্তায় যথেষ্ট আলো আছে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে বুঝতে পারল, বাগানে কেউ নেই। রাস্তাটাও ফাঁকা পড়ে আছে।

হঠাৎ নিচু সাদা বেড়ার আড়াল থেকে সিধে হতে দেখা গেল এক লোককে, ভাঙা জানালার দিকে চোখ রেখে হাতের রাইফেল তুলতে যাচ্ছে কাঁধে। রানা আর দেরি করল না, ট্রিগার টেনে দিল। বিশ গজ দূরের সহজ টার্গেট, লোকটা রাইফেল পুরোপুরি তোলারও সময় পেল না, তার কান দিয়ে ঢুকে খুলিটা উড়িয়ে দিল রানার বুলেট।

ঠিক তখনই বেশ খানিকটা দূরে, রাস্তার মোড়ের কাছে দড়াম করে বন্ধ হলো একটা পার্ক করা গাড়ির দরজা। স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল সেটা।

জানালার কোণে সরে এসে বাগানের ডান পাশ ও বাড়ির সদর দরজার সামনেটা দেখবার চেষ্টা করল রানা, তবে দৃষ্টিপথের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় কিছুই দেখতে পেল না।

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' দরজার পাশ থেকে অস্ফুট বলল লায়লা লেমঁ, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেঝেতে শুয়ে থাকা বাবার দিক থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'আপনি ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে বাবা এতক্ষণে...' কথাটা শেষ না করে শিউরে উঠল মেয়েটা।

'গোলাগুলি হয়েছে, কাজেই পুলিশ আসবে,' বলল রানা। 'বলবেন, কেন

গুলি করা হয়েছে আপনারা জানেন না।' ধীরে ধীরে দরজা খুলে সাবধানে বেরিয়ে যাচ্ছে ও।

রানা বেরুতেই ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল লায়লা লেমঁ। ধাপগুলোর মাথায়, একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনের বাগানটা ভাল করে দেখে নিল ও। কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাগানের ভিতর দিয়ে লোহার গেটের সামনে চলে এল। গেট বন্ধ, তবে তালা দেওয়া নয়। বার তুলে গেট খুলেই দেখতে পেল লাশটা। ডান পাশের গলির মুখে পড়ে আছে, অর্ধেকটা ফুটপাথের উপর। কিন্তু ওর গুলি খাওয়া লাশটা থাকবার কথা বাম দিকে।

রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা, গেট আবার বন্ধ করে জায়গা মত লাগিয়ে দিল বারটা। হাতে পিস্তল, সাবধানে গলিটার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় আরেকটা লাশ পড়ে থাকতে দেখল রানা, এটাও ডান দিকে।

নর্দমার ভিতরে প্রায় ডুবে আছে দ্বিতীয় লাশ, ফুটপাথে আটকে আছে শুধু একটা হাত। হাতের পাশে পড়ে রয়েছে একটা রাইফেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বেঁচে নেই, তবু পালস দেখল রানা। নেই।

একে রানা চেনে না, চেনে না দ্বিতীয় লোকটাকেও। পাশ থেকে একজনের মাথায় গুলি করা হয়েছে, আরেকজনকে মারা হয়েছে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে গুলি করে।

ওখান থেকে বাম দিকে চলে এল রানা। যেখানে পাওয়ার কথা সেখানেই পড়ে রয়েছে তৃতীয় লাশ। রাইফেলটাও রয়েছে পাশে।

চিন্তা করছে রানা। গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ল—কে বা কারা? কারা খুন করল আক্রমণকারীদের?

দু' ব্লক হেঁটে ট্যাক্সি নিল রানা, হোটেলের পথে অনেকদূর চলে আসার পর ওর মনে পড়ল সামান্থা খাবার নিতে বলেছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

পথে ট্যাক্সি থামিয়ে ম্যাকডোনাল্ডসের একটা দোকান থেকে ফাস্ট ফুড কিনল রানা, তারপর ফিরল হোটেলে।

লবিতে ঢুকে এই প্রথম মসিয়ো ফোঁচের চেহারায় হাসির সামান্যতম আভাসও চোখে পড়ল না ওর।

'মসিয়ো!' আহত স্বরে গুঙিয়ে উঠল ফোঁচ। ফ্যাকাসে চেহারা দেখে মনে হলো মারাত্মক অসুস্থ বোধ করছে, জ্ঞান হারাতে পারে যখন-তখন।

'আমার জন্যে নয়,' তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আমার গেস্টের জন্যে বাইরের খাবার আনতে হলো। জানেনই তো, ব্রিটিশ মেয়েরা কেমন হয়।'

'এখন জানলাম!' তিক্ত চেহারায় ভ্রূ কুঁচকে বলল ফোঁচ।

'আমার জন্যে আপনাদের স্পেশাল ডিশ পাঠান,' তাকে আরও খানিকটা ভরসা দিল রানা। 'ভিলের স্ট্যু। আমি ফাস্টফুড তেমন পছন্দ করি না।'

'আচ্ছা,' বলল ফোঁচ। এখন তার চেহারায় একটু একটু করে রং ফিরে আসতে শুরু করেছে।

ঘরে ঢুকে রানা দেখল সামান্থা একটা রোব পরে বিছানায় পা ভাঁজ করে বসে আছে।

হাতের ব্যাগটা কফি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। 'তোমার জন্যে আমাকে এই হোটেল ছাড়তে হতে পারে।'

অবাক হলো সামান্থা। 'কেন?'

ব্যাগটা দেখাল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে ছিটকে নেমে এলো সামান্থা। 'ম্যাকডোনাল্ডস্!'

দশ

বিশ মিনিট পর রানার খাবার নিয়ে এলো ফোঁচ, টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে সামান্থার দিকে একবার নিরাসক্ত, আহত চাহনি হেনে বিদায় নিল। ততক্ষণে সামান্থা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের তৃতীয় ব্যাগটা শেষ করছে। ফোঁচ চলে যেতে সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে লোকটার? চেহারা দেখে মনে হলো বিষ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে!'

'ও বিষক্রিয়ায় অসুস্থ নয়,' বলল রানা। 'ওর ধারণা তুমি বিষ খেয়ে অসুস্থ হতে চলেছ। শুধু তা-ই নয়, সেই সঙ্গে মারাত্মক অপমান করছ ওকে।'

'কেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পছন্দ করে না লোকটা?'

'ওর ধারণা, শুধু ওর হোটেলের খাবার ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত খাবারই ভয়ঙ্কর বিষ।'

'তুমি কী খাবে?'

ট্রের সামনে বসল রানা। 'ব্লাঁকোয়েত দো ভো।'

'ইংরেজিতে কী বলে জিনিসটাকে?'

'ডিলিশাস্।'

রানার কাছে এসে দাঁড়াল সামান্থা, খাবারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে ভিল।'

'জিনিসটা তা-ই। ভিলের স্ট্যু।'

'একটু চেখে দেখব না কি?'

'চেয়ার টেনে এনে বসো,' আমন্ত্রণ জানাল রানা। সামান্থা বসার পর আরেকটা বাটিতে খানিকটা স্ট্যু ঢেলে দিল ও স্বাদ বোঝার জন্য।

এক চামচ মুখে দিয়েই রানার দিকে তাকাল সামান্থা। 'দারুণ টেস্টি তো!'

'মসিয়ো ফোঁচকে বলব তুমি এ-কথা বলেছ, তা হলে হয়তো ওর চোখে খানিকটা ভাল হতে পারবে তুমি।'

সামান্থা যে অন্তর থেকে কথাটা বলেছে, তা বোঝা গেল সে রানার খাবারের অর্ধেকটা প্রায় জোর করে দখল করায়। ফোঁচের দেয়া ওয়াইনের বোতলের অর্ধেকটাও সেই সঙ্গে ঝটপট সাবড়ে দিয়েছে।

'ইয়ামি!' খাওয়া শেষ করে ঘুম-ঘুম চেহারায় হাসল সামান্থা, 'সত্যিই তুলনাহীন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মাতাল হয়ে গেলে নাকি?'

'না, তবে মাথাটা একটু ঘুরছে।'

'তা হলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

জড়িয়ে গেল সামান্থার গলা, মুচকি মুচকি হাসছে, 'তুমি কি আমাকে অন্তরঙ্গ কিছুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছ, রানা?'

'না,' নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল রানা।

ঠোঁট ফোলাল সামান্থা। 'ওহ্!' খানিকটা টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে এক পাশে শুলো সে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শোবে না?'

'শোবো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তিনটে চেয়ার এক করে খাটিয়া বানিয়ে শোবো। আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

'না করে পারছি না যে।' গা থেকে রোবটা সরাল সামান্থা। ওটার নীচে ফ্ল্যানেলের একটা পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ নাইট গাউন পরে আছে। লোভনীয় ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'বলো দেখি, তোমাকে তোমারই বিছানা থেকে বঞ্চিত করি কী করে! চলে এসো!'

'ঘুমাও,' বলে খাবারের ট্রে-টা বাইরের করিডরে নিয়ে রাখল রানা। ফিরে এসে দেখল গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে সামান্থার। ঘুমিয়ে পড়েছে মুহূর্তের মধ্যে।

ঘুমটা ভান নয় বুঝে সামান্যতম দ্বিধা না করে সামান্থার হাত-ব্যাগটার কাছে চলে গেল রানা নিঃশব্দে, ওটা খুলে হাতড়াতে শুরু করল। জানে না কী খুঁজছে, কিন্তু আশা করছে এমন কিছু পাওয়া যাবে যাতে করে বোঝা যাবে সামান্থা যা বলছে তা কতটা সত্যি, বা কতটা মিথ্যা। হাত-ব্যাগে সাধারণ মেয়েলি জিনিসপত্র পেল ও। এম আই ফাইভের কার্ডটাও আছে। আরেকটা জিনিস আছে, একটা বেরেটা ·২৫ অটোমেটিক। পুরোপুরি লোড করা ওটা। তবে অস্ত্রটা পরিষ্কার করা হয়নি বহুদিন।

পিস্তলটা ছাড়া আর সবকিছু আগের মতো করে গুছিয়ে রেখে দিল রানা ব্যাগে, এবার লেমঁর বাড়ি থেকে পাওয়া কাগজের বলগুলো আর প্যাডটা বের করল।

প্রথমে মোচড়ানো কাগজগুলো যতোটা সম্ভব নিভাঁজ করার চেষ্টা করল ও, তারপর মনোযোগ দিল ওগুলোতে কী লেখা আছে দেখতে। বোঝা গেল অলিভার হপকিন্স চিন্তা করার সময় আঁকিবুঁকি কাটতে ভালবাসেন। বেশ চাপ দিয়ে লেখেন তিনি। প্রত্যেকটা কাগজে দু'একটা শব্দ, অসংখ্য রেখা আর দক্ষ হাতে আঁকা কয়েকটা চমৎকার স্কেচ আছে। ওগুলো থেকে কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট হয়তো বুঝতে পারবেন অনেক কিছু, কিন্তু রানার কাছে এ-সবই অর্থহীন। তবে একটা জিনিস ওর নজর কাড়ল। দু'বার দুটো কাগজে ডক্টর হপকিন্স দু'জন করে লোক এঁকেছেন। একজন আরেকজনকে খুন করছে। এ থেকে বোঝা যায় ভদ্রলোক মৃত্যুচিন্তা করছেন।

এবার প্যাডের দিকে মনোযোগ দিল রানা। প্রথম পৃষ্ঠাটা ওর কাছে জরুরি, কারণ ওটাতে থাকতে পারে আগের পৃষ্ঠায় যা লেখা হয়েছে তার ছাপ। আলোর সামনে পাতাটা ধরল রানা। না, সব রেখা আর অক্ষরই জাবড়ানো। একটা পেন্সিল দিয়ে ওগুলোর ওপর বুলিয়ে দেখল। যা সৃষ্টি হলো তা থেকে কোনও অর্থ বের করার উপায় নেই। হতাশ হয়ে প্যাডটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও, তুলে নিল সামান্থার পিস্তলটা, পরিষ্কার করতে শুরু করল। হয়তো কখনোই সামান্থা এটা ব্যবহার করবে না, কিন্তু যদি করে তা হলে করডাইট জমে নলটা এরকম অপরিষ্কার অবস্থায় থাকলে ওর হাতে বিস্ফোরিত হতে পারে এই পিস্তল।

এগারো

সকালে রানার ঘুম ভাঙল পিঠে টিসটিসে ব্যথা নিয়ে। তিনটে চেয়ার এক করে ঘুমিয়েছিল ও। ব্যথাটা সেজন্যই। ইন্টারকমে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল ও হাত-মুখ ধুয়ে এসে, তবে ব্রেকফাস্ট হাজির হবার আগে সামান্থাকে জাগাল না।

'কী হলো?' রানা ডাকতেই ঝট্ করে মাথা তুলে চারদিকে বড় বড় চোখে তাকাল সামান্থা। কয়েক সেকেন্ড পর বুঝতে পারল কোথায় আছে। রানার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'ও, রানা, তুমি! ভুলে গিয়েছিলাম আমি এখানে।'

'কী অবস্থা?' ভ্রূ নাচাল রানা।

'ভাল,' বলল সামান্থা। 'তবে মাথাটা একটু ধরে আছে।'

'আধ বোতল ওয়াইন ঢকঢক করে গিললে মাথা তো ধরবেই।'

'সত্যি আমি আধ বোতল ওয়াইন টেনেছি?' বিছানা থেকে দ্রুত নামল সামান্থা। গাউনটা ওর কোমরের কাছে গুটিয়ে ছিল, মুহূর্তের জন্য রানা সামান্থার ফর্সা, নিটোল ঊরু দুটো দেখতে পেল। টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'যথেষ্ট নাস্তা আনিয়েছ তো?'

'মনে হয়,' রানার গলাটা অনিশ্চিত শোনাল।

দুটো কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়েছিল রানা, কিন্তু দেখা গেল নিজেরটা শেষ করে রানার অর্ধেকটাতেও ভাগ বসাচ্ছে সামান্থা। পেট পুরে খেয়ে খুশি খুশি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছ তুমি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর?'

'খানিকটা পড়ালেখা,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'ইন্টারেস্টিং কিছু?'

'বলতে পারছি না। যা পড়েছি তার মানেই তো জানি না।'

'ওরকম বিরক্তিকর বই পড়ার দুর্ভাগ্য আমারও হয়েছে।' চেয়ার ছাড়ল সামান্থা। 'গোসল করতে যাচ্ছি। তুমি আজকে কী করবে ভাবছ?'

'প্রথম কাজ তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দেয়া,' বলল রানা। 'তারপর কী করব ভেবে দেখিনি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল সামান্থার। 'ঠাট্টা করছ?'

'না। যাও, গোসল সেরে এসো।'

সামান্থা বাথরুমে ঢোকার পর ট্রে দুটো করিডরে ট্রলির ওপর রেখে এলো রানা, আবার অ্যান্থনি লেমঁর বাড়িতে পাওয়া কাগজগুলো নিয়ে বসল। খানিক পর হতাশ হয়ে উঠে পড়ল। কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই ওগুলো দেখে। দরজার পাশে রাইটিং টেবিলের ওপর রেখে দিল ও কাগজগুলো।

পনেরো মিনিট পর শরীরে তোয়ালে পেঁচিয়ে বাথরুম থেকে বেরোল সামান্থা, রানাকে বলল, 'এবার আসতে পারো।'

বাথরুমের দরজা গলে বাষ্প বের হচ্ছে। 'ধোঁয়াটে ভাবটা দূর হলে ঢুকব,' বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে হাসল সামান্থা। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতোই তরতাজা দেখাচ্ছে তাকে। 'আমি গরম পানিতে গোসল করতে পছন্দ করি।'

'কোনও সন্দেহ নেই তাতে,' বলল রানা। গরম পানির কারণে সামান্থার সোনালী ত্বক লালচে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছে ও। যা দেখতে পাচ্ছে না সেসবের কথা এক পলকের জন্য ওর চিন্তায় খেলে গেল। 'গোসল সেরে বেরিয়ে এসে মসিয়ো ফোঁচের সঙ্গে তোমার ঘরের ব্যাপারে কথা বলব।'

'দরকার কী?' আপত্তির সুরে বলল সামান্থা। 'আমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তোমার সঙ্গে ঘর শেয়ার করতে। আর তা ছাড়া, তুমি এখন পর্যন্ত পারফেক্ট জেন্টলম্যানের মতোই আচরণ করেছ।'

'তা করেছি,' বলল রানা, 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারাক্ষণ আমি ভদ্রলোক থাকব।' কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। বেরিয়ে এলো দশ মিনিট পর। সামান্থাকে বিছানায় চাদর গায়ে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, আবার ঘুমাবে?'

'এবার আমি বিছানায় একা থাকব না।' দুষ্টু হাসল সামান্থা। 'আর আধবোতল ওয়াইনও খাইনি আমি এবার।' চাদর সরিয়ে রানার দিকে রমণীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো সে। চাদরের তলায় কিছুই গায়ে নেই ওর!

একটু থমকে গেল রানা। 'সামান্থা...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই ওর ঠোঁট চলে গেল সামান্থার লোভনীয় পুরুষ্টু ঠোঁটের দখলে। মুখের ভেতর সামান্থার জিভের নড়াচড়া টের পেল ও। সামান্থার ম্যানিকিউর করা সুন্দর নখ ওর পিঠ খামচাচ্ছে, শরীরের যত্রতত্র চলে যাচ্ছে সামান্থার হাত দুটো।

কয়েক সেকেন্ড নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার মানল রানা। বাধ্য হলো সাড়া দিতে।

ওকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে পিছু হটছে সামান্থা। 'চলে এসো, রানা। আমি শুধু বাড়তি রুমের খরচটা বাঁচাতে চাইছি। এক সঙ্গে কাজ করছি না আমরা? তার মানে খরচটাও সমান ভাবে বহন করব। সবকিছু শেয়ার করছি আমরা, কী বলো?' খিলখিল করে হাসল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর রানাকে আবার বাথরুমে ঢুকতে হলো। এবার গোসল

সেরে পোশাক পরে বেরিয়ে এসে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল ও। সামান্থা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু অর্ডার দিচ্ছ, রানা?'

'না। তোমার ঘরের ব্যাপারে আলাপ করব।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সামান্থার চেহারা। 'কিন্তু আমি মনে করেছিলাম...'

'বিপদে পড়ে যেতে পারো তুমি আমার সঙ্গে একই ঘরে থাকলে,' ওকে থামিয়ে দিল রানা।

প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সামান্থা, কিন্তু তার আগেই ইন্টারকম তোলা হয়েছে ডেস্ক থেকে, রানা বলল, 'মসিয়ো ফোঁচ। রবার্ট হিরাম বলছি।'

'আহ্, মশিয়ো, রাতটা কেমন কাটল?'

'ভাল। মসিয়ো ফোঁচ...'

'ডিনার আর...'

'ডিনার-ব্রেকফাস্ট দুটোই বরাবরের মতো তুলনাহীন।'

'মার্সি, মসিয়ো রবার্ট। আজকের রাতটা...'

ফোঁচকে কথা বাড়ানোর সুযোগ দিল না আর রানা। 'আমার বান্ধবীর ঘরটা কি এখন পাওয়া যাবে?'

'পরিষ্কার করা হচ্ছে, মসিয়ো।'

'রেজিস্টারের জন্যে ওর নাম লাগবে। ওর নাম সামান্থা লেইটার।'

'ঘর তৈরি হলে আপনাকে জানাব, মসিয়ো,' বলল ফোঁচ। 'নামটা তুলে নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

ইন্টারকম নামিয়ে রাখল রানা।

বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে সামান্থা বলল, 'আমি কাপড় পরতে যাচ্ছি, ঘর রেডি হলে আমাকে জানিয়ো।' তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

চিন্তিত চেহারায় দরজাটার দিকে তাকাল রানা মেয়েটার আচরণ হঠাৎ করেই পাল্টে গেছে।

'তোমার ঘর তৈরি হয়ে গেছে,' সামান্থা বাথরুম থেকে বের হতেই জানাল রানা। সামান্য মেকআপ করেছে মেয়েটা, খেয়াল করল ও। আগের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে ওকে দেখতে।

'তোমার ঘরে থাকতে দেয়ায় ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল সামান্থা। 'আর তোমার বিছানা ব্যবহার করতে দেয়ার জন্যেও।' নিজের জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করল সে।

রানা বলল, 'তোমার ঘরটা করিডরের উল্টোদিকে এক ঘর পর। মসিয়ো ফোঁচ কীভাবে ম্যানেজ করল কে জানে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সামান্থা, তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখছে। রাইটিং ডেস্কে রাখা কাগজগুলো নাড়াচাড়া করছে রানা। ওকে অবাক করে দিয়ে সামান্থা বলল, 'ওগুলো ঘেঁটে দেখেছি আমি।'

'তাই?'

'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন। মানে কী ওসবের?'

'জানি না। জানতে চেষ্টা করছি। তোমার কী মনে হয়েছে ওগুলো দেখে?'

'প্রায় কিছুই বুঝিনি,' বলল সামান্থা। 'তবে সুইটযারল্যান্ডে বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় আইস স্কেটিং করতে গিয়েছিলাম, সে-কথা মনে পড়ে গেল।'

কথাটা ধরল রানা। 'সুইটযারল্যান্ডের কথা মনে হলো কেন?'

একটা কাগজ বেছে বের করে উল্টোদিকটা দেখাল সামান্থা। 'এই স্কেচটা। এটা গোটা সুইটযারল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত শ্যালেগুলোর একটা। বরং বলা ভাল এটাই সেরা। ওখানে স্কি করেছি আমি, কাজেই চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি।'

চিন্তিত মনে স্কেচটা দেখল রানা।

সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সুটকেসটা আমার ঘরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে?'

'কী? ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' কাগজটা পকেটে রাখল রানা।

ব্যাপারটা খেয়াল করেছে সামান্থা। 'কাগজটা পকেটে রাখলে যে? কী করবে ওটা দিয়ে?'

'ওটাই হয়তো আমাকে আমার পরবর্তী গন্তব্য বলে দেবে।'

'সুইটযারল্যান্ড?'

'হতে পারে।' সুটকেস তুলে নিল রানা। 'চলো, তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিই।'

করিডরের ওপাশে একটা ঘরের দরজাই খোলা আছে। ঘরটাতে ঢুকে রানা বলল, 'চাবি পাবে তুমি বিছানার পাশের টেবিলের ওপরে।'

'পেয়েছি।' রানাকে চাবিটা দেখাল সামান্থা। ওর চোখ রানার চোখ দুটোকে খুঁজে নিল। 'রানা, কদিন আছি আমরা এখানে?'

'কিছু কাজ বাকি আছে,' বলল রানা। 'ওগুলো সেরে ফেলতে হবে। ধরো, আগামীকাল চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'হয়তো স্কি করতে।' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

বারো

ঘরে ফিরে দরজায় তালা দিয়ে প্রথমেই সুটকেসটা বিছানার ওপর রেখে খুলল রানা। ওটার গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল কমিউনিকেশন ডিভাইস। জিনিসটা শামশের আলীর খেলনা, বিএসএস-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণার সময় আবিষ্কার করেছেন। ডিভাইসটা টেলিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দিতেই টু-ওয়ে

মনিটর হয়ে গেল ওটা। সেই সঙ্গে শব্দও আদানপ্রদান করবে। টিভি চালু করতেই একটু পর মার্ভিন লংফেলোর চেহারাটা স্ক্রিনে দেখতে পেল ও।

'তুমি যোগাযোগ করবে সে-অপেক্ষাতেই ছিলাম,' জানালেন লংফেলো। 'গ্লাসগোতে কী ঘটেছে? আমাদের ওয়াচারকে না বলেই চলে গেছ তুমি।'

'প্যারিসে আসতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা।

ভ্রূ উঁচু করলেন লংফেলো। 'প্যারিস?'

'ডক্টর হপকিন্স এখানেই এসেছিলেন।'

'আচ্ছা! তো প্যারিসে আমাদের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পারতে।'

'আপাতত একাই কাজ করব ঠিক করেছি,' বলল রানা। 'গ্লাসগোতে আপনাদের ওয়াচার লোকটাকে মোটেও উপযুক্ত মনে হলো না।'

'ও।' চেহারায় কালো ছায়া ঘনাল লংফেলোর। 'তুমি কোনও বিপদের মধ্যে নেই তো, রানা?'

'এখানে এখনও কোনও বিপদ হয়নি,' বলল রানা। 'তবে অনেকেই জানে আমি কোথায় আছি।'

'গ্লাসগোতে তোমার ওপর আক্রমণটা কুরিয়ার কিলারেরই কাজ ছিল, জানা গেছে।'

'তাই নাকি? আহত ছিলাম, তা ছাড়া টিউবটা তখন আমার সঙ্গেই ছিল কাজেই সরে যাই আমি।'

'ওয়াইয ডিসিশন,' বললেন লংফেলো। 'প্যারিসেই আছ আরও কয়েকদিন?'

'না। ডক্টর হপকিন্স সম্ভবত সুইটযারল্যান্ডে গেছেন। আমিও ওখানে যাচ্ছি।'

'প্যারিসেই ছিলেন উনি, সেটা ঠিক জানো তো?'

'হ্যাঁ। এক বন্ধুর বাসায় ছিলেন। দু' দিন আগে চলে যান ওখান থেকে ওখানে বেশিক্ষণ ছিলেন বলে মনে হয় না। আমি ওখানে যাওয়ার পর তিন-তিনটে লাশ পড়েছে, মিস্টার লংফেলো। তার মধ্যে আমি মাত্র একজনকে গুলি করেছি।'

'ওহ্, গড!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। 'তুমি কাউকে চিনতে পেরেছ?'

'না।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লংফেলো। 'আচ্ছা,' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন তিনি, 'কেন তুমি ভাবছ উনি সুইটযারল্যান্ডে গেছেন?'

স্কেচটার কথা জানাল রানা, তারপর বলল, 'সুইটযারল্যান্ডে ডক্টরের কোনও বন্ধুবান্ধব আছে কি না খোঁজ নেয়া দরকার। এমন কেউ, যার কাছে গিয়ে উঠতে পারেন ডক্টর। আন্দাজ করছি তিনি সুইটযারল্যান্ডেই গেছেন।'

'ঠিক আছে, ওখানে তাঁর পরিচিত কেউ আছে কি না খোঁজ নেব আমি।'

'সুইটযারল্যান্ডে পৌঁছে আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' চিন্তিত হলো রানা। ডক্টর একটা নির্দিষ্ট শ্যালের স্কেচ এঁকেছেন, তার মানেই কিন্তু এই নয় যে তিনি সুইটযারল্যান্ডে গেছেন। বলতে গেলে এপর্যন্ত সম্পূর্ণ আন্দাজের

ওপর নির্ভর করে এগোতে হয়েছে ওকে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে কাজের কাজ কিছুই হলো না। ‘ওখানে কিছু পাব, এমন নিশ্চয়তা নেই। অনেকটা মরীচিকার পিছনে ছুটছি আমি এখন, সার।’

‘বুঝতে পারছি। প্যারিস ছাড়ছ কখন?’

‘আজই,’ বলল রানা, ‘এখানে থাকার আর কোনও মানে হয় না।’

‘আর মিস লেইটার?’

‘ওকেও সঙ্গে নেব। ওর ওপর একটা চোখ রাখতে চাই। কখন কী বিপদে পড়ে যায়।’

‘ঠিক আছে,’ বললেন লংফেলো। ‘সাবধানে থেকো, রানা। গুডবাই।’

‘গুডবাই।’

স্ক্রিনের ভিতর থেকে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন লংফেলো। টিভি বন্ধ করে দিল রানা। কমিউনিকেশন ডিভাইসটা আবার ঠাঁই পেল সুটকেসের গোপন কম্পার্টমেন্টে। সুটকেস বন্ধ করে ডেস্কে ইন্টারকম করল ও।

‘মসিয়ো ফোঁচ, রবার্ট হিরাম বলছি।’

‘বলুন, মসিয়ো?’

‘আমার বিল তৈরি করে ফেলুন। একটু পর চলে যাচ্ছি আমি।’

‘আর আপনার বান্ধবী, মসিয়ো?’

‘ওর বিলও তৈরি করুন। চেক-আউট করছি আমরা।’

‘ওঁর ঘরের জন্যে টাকা দিতে হবে না, মসিয়ো,’ বলল ফোঁচ। ‘নীচে নামলেই আপনার বিল পেয়ে যাবেন।’

ইন্টারকম রেখে তৈরি হয়ে নিল রানা। সামান্থার ঘরের নম্বরে ডায়াল করল ও। ওদিকে রিসিভার তোলায় জিজ্ঞেস করল, ‘সুটকেস খুলেছ?’

‘না। এখনও সময় করে উঠতে পারিনি।’

‘তা হলে আর খুলো না,’ বলল রানা। ‘আমরা চলে যাচ্ছি। রেডি হতে পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছ তুমি।’

‘আমি তৈরি,’ জানাল সামান্থা। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, ‘হঠাৎ মত বদলালে যে?’

‘দেরি করে লাভ নেই।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

পনেরো মিনিট পর হোটেল ছাড়ল ওরা। ফোন করে বুকিং নেয়ায় বিকেলের বিমানে টিকেট পেতে অসুবিধে হলো না। সারাদিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে শহর ঘুরল ওরা দুপুর পর্যন্ত, লাঞ্চ করল রাস্তার পাশের একটা রেস্তোরাঁয়, তারপর তিনটের সময় হাজির হয়ে গেল এয়ারপোর্টে। একটু পরেই সুইস এয়ার ছাড়বে জেনেভার উদ্দেশে।

স্টুয়ার্ডেস এসে জানতে চাইল ওরা কোনও ড্রিঙ্ক নেবে কি না। কমলার জুস নিল সামান্থা। রানা আপেলের। সন্ধ্যার পরপরই ডিনার সার্ভ করা হলো যাত্রীদের।

একসময় একঘেয়ে প্লেন জার্নি শেষ হলো।

এয়ারপোর্টে নিজেদের ব্যাগ সংগ্রহ করল ওরা, দায়সারা কাস্টমস চেকিং শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল। কোনও নির্দিষ্ট হোটেলে ওঠার ব্যাপারে রানার মাথাব্যথা নেই, কাজেই হোটেল নির্বাচন ড্রাইভারের ওপরেই ছেড়ে দিল ও।

'কাস্টমসের ওরা তোমার পিস্তলটা পেল না কেন?' রানার দিকে তাকাল সামান্থা।

'বিশেষ এক জায়গায় লুকানো ছিল,' বলল রানা। মনে মনে বলল, তোমারটাও তো পায়নি। আন্দাজ করল, বেরেটা পিস্তলটা এখন সামান্থার নিটোল উরুর ভেতরের দিকে হোলস্টারে আছে।

'খুব ক্লান্তি লাগছে,' জেনোয়া হোটেলের লবিতে ঢুকে বলল সামান্থা।

'সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'কাল সকালে কথা হবে তোমার সঙ্গে।'

রানার দিকে তাকাল সামান্থা, বুঝতে পেরেছে আলাদা ঘরেই থাকতে হবে, কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছু বলল না। ক্লার্ককে কানেকটিং রুম দিতে বলল রানা। বেল-বয় ওদের সুটকেস ঘরে পৌঁছে দিল। রানা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে সামান্থার গলা শুনতে পেল: 'গুডনাইট, রানা।'

'গুডনাইট,' না ফিরেই বলল ও।

বেল-বয়কে টিপ্‌স্‌ দিয়ে বিদায় করল। দরজা বন্ধ করে ভাবল, বিএসএস চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করবে কি না। সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালে যোগাযোগ করাটাই ভাল হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে কিছুটা সময় দেওয়া দরকার।

সুটকেসটা না খুলে ঘরের কোণে রেখে দিল ও। এবার পাশের ঘরে যাবার দরজায় কান পাতল। ওদিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। নব মুচড়ে বোঝা গেল দরজা তালা মারা। নিজের দিক থেকে ছিটকিনি আটকে দিল ও। কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে গায়ের ওপর টেনে দিল চাদর। মাথার নীচে দু'হাত রেখে ভাবতে শুরু করল গত কয়েকদিনে কী কী ঘটেছে।

গ্লাসগোতে ওর ওপর যে আক্রমণ হলো সেটা কি কুরিয়ার কিলারের কাজ? কিন্তু ওকে খুন করল কে? আর প্যারিসের লাশগুলো। কাদের লাশ? কারা ফেলল?

পাশ থেকে জ্যাকেট তুলে নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম টিউবটা বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। ঠিক যেন সিগারের টিউব। সিদ্ধান্তে এলো, কাল সকালে স্মোক শপে গিয়ে এরকম কয়েকটা সিগার কিনবে। টিউবটা পকেটে রেখে বেডপোস্টে ঝুলিয়ে দিল জ্যাকেট, তারপর বাতি নিভিয়ে চোখ বুজল, ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরেই।

তেরো

সকালে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিল রানা, তারপর সামান্থার ঘরে ইন্টারকম

করে বলল: সে যেন হোটেলের ডাইনিং রুমে ওর সঙ্গে নাস্তা খেতে নামে। সামান্থা জানাল, আধঘণ্টা লাগবে ওর রেডি হতে।

ইন্টারকম রেখে লবিতে নেমে এলো রানা, সিগার কিনবে। হোটেলের দোকানগুলোতে সিগার পাওয়া গেল না। বেল ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল দু'ব্লক পরেই একটা স্মোক শপ আছে।

পাঁচ মিনিট লাগল ওর দোকানে পৌঁছাতে। পুরোটা সময় সতর্ক থাকল রানা, কেউ অনুসরণ করলে ঠিকই টের পাবে। তবে জানে, কারও পিছু নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গতকাল সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে বিকেলে হঠাৎ করেই এয়ারপোর্টে গিয়ে জেনেভাগামী প্লেনে উঠেছে ওরা।

দোকানিকে জিজ্ঞেস করতেই দামি কয়েকটা ব্র্যান্ডের সিগার দেখাল সে। সিল করা সিগারগুলো অ্যালুমিনিয়াম টিউবের মধ্যে আছে, দেখতে ঠিক ওর পকেটে রাখা টিউবটার মতো, তবে খেয়াল করলে বোঝা যায় ওগুলো দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো। একই ব্র্যান্ডের পাঁচটা সিগার কিনল রানা, রেখে দিল কোটের পকেটে রাখা টিউবটার সঙ্গে। হোটেলে ফিরে সরাসরি ডাইনিং রুমে চলে এলো। সামান্থা এখনও নামেনি। একটা টেবিল দখল করে কফির অর্ডার দিল রানা, অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময় সামান্থা নেমে আসবে।

ইন্টারকম করার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নামল সামান্থা। ফুলের মতো ফুটফুটে লাগছে ওকে দেখতে। সে-কথাই সামান্থাকে জানাল রানা।

'ধন্যবাদ।' মৃদু হাসল সামান্থা। 'সাজগোজ করতে দেরি হয়ে গেল, এই একটা অজুহাত দেখিয়েই মেয়েরা পুরুষদের অনুযোগ থেকে রক্ষা পায়।'

'তাই?' মেনুটা রানা ঠেলে দিল সামান্থার দিকে।

ওটাতে চোখ বুলিয়ে নিজের জন্য অর্ডার দিল সামান্থা। রানাও বলে দিল ওর জন্য কী আনতে হবে। ব্রেকফাস্ট আসার পর দেখা গেল রানার দ্বিগুণ খাবারের অর্ডার দিয়েছে সামান্থা।

প্রতিটা পদই সুস্বাদু, কাজেই তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা। নাস্তা শেষে কফিতে চুমুক দিয়ে সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'আজ কী করবে বলে ভাবছ?'

এড়িয়ে গেল রানা। 'তুমি শপিঙে যেতে পারো।'

'শপিং?' ভ্রূ কুঁচকে গেল সামান্থার। 'শপিং করতে এখানে আসিনি আমি।'

'জানি,' বলল রানা। 'তবে জরুরি কিছু তথ্য পাবার আগে কিছু করার নেই আমাদের।'

রানার চোখে তাকাল সামান্থা। 'কী তথ্য আমাকে বলতে পারো। আমার সোর্সরা হয়তো তথ্যগুলো অনেক দ্রুত সংগ্রহ করতে পারবে।'

'কী তোমার সোর্স, বা কারা তারা, সেটা বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এম আই ফাইভের সোর্স?'

জবাব দিল না সামান্থা, রহস্যময় হাসি হাসল। 'কেন, অন্য কোনও সোর্স থাকতে পারে না?'

একটু চুপ করে থেকে রানা বলল, 'দুপুর একটায় লাঞ্চের সময় তোমার সঙ্গে

দেখা হবে। মাঝখানের সময়টা শপিং কিংবা নিজের পছন্দ মতো কিছু করে কাটাও তুমি।'

সন্দেহ নিয়ে রানাকে দেখল সামান্থা। 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফেলে সরে পড়ার কথা ভাবছ না?'

'অবশ্যই না।'

'গ্লাসগোতে কিন্তু তাই করেছিলে তুমি। এখানেও ওরকম করবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

রানা মনে করিয়ে দিল, 'আমরা তখন পার্টনার ছিলাম না।'

'তা ঠিক।' মাথা দোলাল সামান্থা। 'তবে নিজেকে আমি সমান অংশীদার বলে মনে করতে পারছি না। মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আমার কাছ থেকে চেপে যাচ্ছ তুমি।'

'তাই?' কফির কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখল রানা। 'তুমিও আমার কাছ থেকে কোনও কিছু গোপন করছ না তো?'

অপ্রস্তুত চেহারায় মুহূর্তের জন্য কী যেন চিন্তা করল সামান্থা, তারপর বলল, 'এক কাজ করা যাক, ঠিক একটায় আমরা এখানে লাঞ্চের জন্যে আসব, ঠিক আছে?'

'চমৎকার প্রস্তাব!' উঠে পড়ল রানা।

উঠল সামান্থাও। হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল সে। নিজের ঘরে ফিরল রানা।

সামান্থা একটু পরেই ফিরে আসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, কাজেই দু'ঘরের মাঝখানের দরজার তালা খুলে কবাট পুরো হাট করে রাখল ও, তারপর কমিউনিকেশন ডিভাইসটা ব্যবহার করে টিভিটার রূপান্তর ঘটাল। আধমিনিট পর মার্ভিন লংফেলোর চিন্তিত চেহারাটা ভেসে উঠল পর্দায়।

'কী খবর, রানা?'

'যে তথ্যগুলো চেয়েছিলাম সেগুলো কি জোগাড় হয়েছে?' সরাসরি কাজের কথায় এলো রানা।

'ডক্টর হপকিন্সের ব্যাপারে? হ্যাঁ। সুইটযারল্যান্ডে দু'জন বন্ধু আছে তাঁর। একজন জেনেভাতেই থাকে, আরেকজন শহরের খানিকটা বাইরে, একটা পল্লীতে।'

দুটো নাম আর ঠিকানা বললেন লংফেলো, একটা কাগজে সেগুলো টুকে নিল রানা। এবার জিজ্ঞেস করল, 'আর এম আই ফাইভের ব্যাপারে?'

'ও নিয়ে একটু সমস্যায় আছি। এম আই ফাইভের কম্পিউটারে আমাদের অ্যাক্সেস নেই। তাদের চিফ মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নির্দেশ না পেলে তারা আমাদের অ্যাক্সেস দেবে না। এদিকে বিএসএস-এর সম্মানের কথা চিন্তা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সব খুলে বলতেও বাধছে। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের সংগঠনের দুর্বলতাটা স্বীকার করতেই হবে।'

'ওরা যদি ইনফরমেশন দিতে না চায় তা হলে বিএসএস-এর কম্পিউটার এক্সপার্টরা ওদের টার্মিনালে হ্যাক করতে পারে না?'

'সে-চেষ্টাই করা হচ্ছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'ওদের সাধারণ একজন কম্পিউটার অপারেটর যদি অ্যাক্সেস পায় তা হলে বিএসএস কেন পাচ্ছে না?'

'আমরা চেষ্টা করছি, রানা।' মার্ভিন লংফেলোকে দেখে মনে হলো ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'আর কিছু বলবে?'

'না।'

'ভাল থেকো, রানা।'

'সেম টু ইউ, সার। গুডবাই।'

'গুডবাই।'

টিভি বন্ধ করে দিল রানা, কমিউনিকেশন ডিভাইসটা সুটকেসে রাখল। সামান্থার ঘরে ঢুকে দেখল মেয়েটা এখনও ফেরেনি। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে তালা মেরে দিল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল নিজের সুইট থেকে। ঠিক করেছে প্রথমে ডক্টরের যে বন্ধু জেনেভাতে থাকে তার কাছে খোঁজ নেবে। অন্যজনের ওখানে যেতে হলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে ওকে। সেটা পরে করা যাবে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ক্যাব নিল রানা, লংফেলোর কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানা জানাল ড্রাইভারকে। কয়েক মাইল যাবার পর বুঝতে পারল ঠিকানাটা শহরের পুরোনো, নির্জন একটা অংশে। নতুন বাড়ি-ঘর নেই এই এলাকায়। নিথর, কালো সাপের মতো পড়ে থাকা ফাঁকা রাস্তার দু'ধারে ছবির মতো সুন্দর একতলা কিংবা দোতলা সব বাগান-বাড়ি।

একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামল ক্যাব।

রানা যাকে খুঁজছে তার নাম ফ্রেডরিক হেইঞ্জ। বাড়ির দরজায় কালো একটা নেমপ্লেট রয়েছে, তাতে লেখা নামটা মিলে গেল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে কলিং বেল বাজাল রানা। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। সাড়া দিচ্ছে না কেউ ভিতর থেকে। আবার বেল বাজাল ও। আবারও অপেক্ষা। পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর পকেট থেকে লকপিক বের করে তালাটা খুলে ফেলল রানা, সাবধানে দরজা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল।

নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল ও দরজাটা, তারপর পাথরের মতো স্থির দাঁড়িয়ে কান পাতল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওর মগজের ভেতর ঘণ্টি বাজাচ্ছে। ওয়ালথারটা বেরিয়ে এলো হাতে। একটা ছোট ফয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ও। সামনে, খানিকটা দূরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। করিডরের ডানে-বামে ঘরের দরজা। বাইরে উজ্জ্বল আলো থাকলেও বাড়ির ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। পুরো বাড়ি কবরের মতো থমথমে নীরব।

মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির করে উঠল রানার। ওর মন বলছে ওর আগেই এখানে পৌঁছে গেছে কেউ। ওর মন কি ভুল করছে? এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ওর অনুভূতি তো সাধারণত ভুল করে না। তা হলে কি যে এসেছে সে কোথাও ওঁৎ পেতে এখন ওর জন্যই অপেক্ষা করছে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, কান খাড়া। পায়ের সামান্য আওয়াজ কিংবা মেঝের কাঠে চাপ পড়ার শব্দ হতে পারে। হলে বোঝা যাবে আরও কেউ আছে এ-বাড়িতে। কিন্তু কোনও শব্দ নেই। যদি কেউ থেকেও থাকে তা হলে সে অত্যন্ত সাবধানী।

ডান-বামের ঘরগুলো ছাড়াও হলওয়ের শেষে আরেকটা ঘর আছে। ওটা সম্ভবত কিচেন। দোতলায় বোধহয় বেডরুমগুলো। রানা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করল প্রথমে কোথায় খুঁজবে। একতলা, না দোতলা থেকে খোঁজা শুরু করবে ও? সত্যি যদি আততায়ী এখানে এসে থাকে তা হলে এখন হয়তো ঘরগুলোর কোনও একটায় অপেক্ষা করছে ওকে খুন করার জন্য।

আগে দোতলায় খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ডক্টর হপকিন্স যদি এ-বাড়িতে এসেই থাকেন তা হলে তিনি গেস্টরুমে থাকবেন। সেটা দোতলায় হবার সম্ভাবনাই বেশি। নিঃশব্দে সিঁড়ির কাছে চলে গেল রানা, পাশ ফিরে উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে, যেন একই সঙ্গে দোতলার ল্যান্ডিং আর নীচের ল্যান্ডিঙে চোখ রাখতে পারে। নিজের কাপড়ের খসখস আওয়াজ ওর কানে জোরাল লাগছে শুনতে।

দোতলায় উঠতে লেগে গেল ছয় মিনিট। বামদিকে একটা প্যাসেজ দেখল রানা। ডানদিকে একটা খোলা দরজা। পিস্তল হাতে দরজাটার পাশে দাঁড়াল ও। ওটা একটা ছোট বাথরুম। এতোই ছোট যে ওখানে কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বাম প্যাসেজ ধরে এগোল ও, সিঁড়ির দিকেও চোখ রেখেছে। আরও খানিকটা এগোনোর পর পরিচিত একটা গন্ধ এলো নাকে। এ গন্ধ আগেও বহুবার পেয়েছে মাসুদ রানা।

তাজা রক্তের আঁশটে, গা গুলানো গন্ধ।

সামনের প্রথম ঘর থেকেই আসছে গন্ধটা। ঝট্ করে দরজা পেরিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল রানা, ওয়ালথার প্রস্তুত। এক পলকে ঘরের ভেতরটা দেখা হয়ে গেল ওর। বাম হাতে পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। আততায়ী ওর অজান্তে ওদিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না এখন।

বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে আছে গলাকাটা লাশ। ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। আতঙ্কের মুখোশ যেন মৃতদেহের বিকৃত ওই চেহারা। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মণি উল্টে গেছে, সাদা অংশ হয়ে গেছে টকটকে লাল। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরেছিল, শুকিয়ে গেলেও গালে তার দাগ রয়ে গেছে। এ-ই সম্ভবত ফ্রেডরিক হেইঞ্জ। তার বিছানায় বালিশের পাশে একটা নাইন এমএম লুগার শুয়ে আছে। ওটা কোনও কাজে আসেনি তার। কিন্তু হেইঞ্জকে খুন করা হলো কেন? ডক্টর হপকিন্স কি এসে উঠেছিলেন হেইঞ্জের বাড়িতে? কোথায় তিনি এখন? একের পর এক প্রশ্ন আসছে রানার মাথায়, কিন্তু একটারও জবাব জানা নেই ওর।

লাশের চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, নিঃশব্দে চলে এলো

দরজার কাছে, তারপর এক ঝটকায় দরজা খুলেই বসে পড়ল এক হাঁটু মুড়ে, পিস্তলটা এমন ভাবে ধরে আছে যাতে মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনও দিকে গুলি করতে পারে। করিডরে নেই কেউ। পরের ঘরটা খুঁজে দেখতে পা বাড়াল রানা নিঃশব্দে।

আগের মতোই সাবধানে ঘরের দরজার পাশে চলে গেল ও, কবাট ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে নিশ্চিত হলো দরজার পেছনে কেউ নেই। এবার ঘরে ঢুকেই এক পাশে সরে দাঁড়াল বিদ্যুদ্বেগে। ভিতরে নেই কেউ। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। এবার ক্লজিট খুলে দেখল। খালি।

অ্যান্থনি লেমঁর গেস্টরুম যেরকম ভাবে খুঁজেছিল সেভাবেই খুঁজতে শুরু করল ও পুরো ঘর। এ-ঘরে কোনও রাইটিং ডেস্ক নেই। তবে একটা ট্র্যাশ বাকেট আছে। কিছু পাওয়া গেল না ওটার ভেতর। ডক্টর হপকিন্স এখানে ছিলেন তার কোনও আলামত নেই। তা হলে ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে খুন করা হলো কেন?

ডক্টর হপকিন্স যদি এখানে না-ই থাকেন, বা ইদানীংকালে না-ই এসে থাকেন, তা হলে হেইঞ্জকে হত্যা করার অর্থ কী? একটা ব্যাপার হতে পারে··· চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা। বড় বেশি অলীক কল্পনা হয়ে যায়। মার্ভিন লংফেলো কি...নাহ্, তা কী করে হয়!

ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল চিন্তিত রানা। পরক্ষণেই ছিটকে এক পাশে সরে যেতে হলো ওকে। জানালায় ওকে দেখেই রাস্তায় দাঁড়ানো এক লোক এক ঝটকায় সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা এদিকে তাক করেছে। এক পলকে রানার দেখা হয়ে গেছে, একটা সাদা মুখোশে তার চেহারা ঢাকা। রানা সরার আধসেকেন্ড পরেই জোরাল কাশির মতো একটা শব্দ হলো। তার আগেই ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে চুরচুর হয়ে যাওয়া জানালার কাঁচ। ভোঁতা আওয়াজ করে দেয়ালে নাক গুঁজল শক্তিশালী বুলেট। আততায়ী তৈরি থাকলেও সামান্য একটু দেরি করে ফেলেছে। ক্ষিপ্রগতি রিফ্লেক্সের কারণে বেঁচে গেছে রানা, নইলে বুলেটটা ঠিক ওর হৃৎপিণ্ডে ঢুকত। আরেকটা গুলি করল নীচের লোকটা। জানালার চৌকাঠ ছিন্নভিন্ন করে দিল বুলেট। কাঠের কুচি ছিটকে এসে লাগল রানার মুখে। এক মুহূর্ত দেরি না করে জানালার পাশ থেকে উঁকি দিল রানা, ওয়ালথার তাক করার সময় নেই, আন্দাজে গুলি করল লোকটা যেখানে ছিল সে-জায়গাটা লক্ষ্য করে। পরিষ্কার দেখতে পেল গুলিটা চুরমার করে দিয়েছে ওর হাতের কব্জি। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। ধড়াস করে তার পাশেই পড়ল লোকটা।

ডানপাশে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঝট্ করে ফিরল ওদিকে রানা। আরেকজন। এর মুখেও সাদা মুখোশ। হাতের পিস্তল সোজা রানার দিকে তাক করা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল কেশে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে সরে গেল রানা, আরেকটা কাঁচ ভাঙলো জানালার। কিন্তু আবার জানালা দিয়ে পিস্তল তাক করতে গিয়ে জায়গামত পেল না রানা ওকে। দেখল রণে ভঙ্গ দিয়ে দৌড়াচ্ছে লোকটা প্রাণপণে।

রাস্তার পিচে ঢুকে গেল রানার ·৩৮ রিমফায়ার প্যারাবেলাম বুলেট। তীরের মতো ছুটছে লোকটা, বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে। আর পঁচিশ গজ গেলেই

রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যাবে। জানালা টপকে লাফ দিল রানা, নীচে পড়ে মনে হলো হাঁটুর ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিয়েই খানিকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল ও মুখোশধারীর পেছনে।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। প্রথম আততায়ীর কপালে লাল একটা গর্ত! কিন্তু ... কিন্তু ও তো মেরেছিল হাতে!

বাঁক নিল সামনের লোকটা। একে ফেলে ছুটল রানা ওর পিছনে। আধমিনিট পর বাঁক ঘুরে দেখল ওর সঙ্গে দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে আততায়ীর। পিস্তল কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখে গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল ও। হাঁটু দুটো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। লোকটা ছোট একটা চৌরাস্তা পেরিয়ে আরেকটা বাঁকের দিকে ছুটছে। ক্রমেই দূরত্ব বাড়ছে আরও। ও ভাবল, পিস্তল বের করবে নাকি? গুলি করবে লোকটাকে লক্ষ্য করে? সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল ছুটন্ত রানা।

অ্যাম্বুলেন্স, না কি পুলিশের গাড়ি?

জবাবটা পেতে দেরি হলো না। মুখোশ পরা লোকটার পিছু নিয়ে চৌরাস্তার কাছাকাছি পৌঁছাতেই ছোট একটা পুলিশের গাড়ি ওর পথ রোধ করে কড়া ব্রেক কষে থামল। তিনজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ছিটকে বের হলো গাড়িটা থেকে। তিনজনের হাতেই পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। ছুটন্ত রানার দিকে অস্ত্রগুলো তাক করল তারা। একজন অফিসার ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্টপ!' রানার চেহারা আর গায়ের রং দেখে বুঝতে পেরেছে ও বিদেশি।

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, থেমে দাঁড়াল, মাথার ওপর তুলে ফেলল দু'হাত। ওয়ালথারটা এখন ওর কোমরে গোঁজা।

পুলিশ অফিসাররা এগিয়ে আসছে সাবধানে। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল রানা, বলার চেষ্টা করল একজন অস্ত্রধারী পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচণ্ড এক ধমকে থামিয়ে দেয়া হলো ওকে। অফিসাররা ওকে খোলা রাস্তা ধরে একজন লোককে তাড়া করতে দেখেছে। দেখেছে ওর কোমরের বেল্টে পিস্তল গোঁজা। একটা খুনের ব্যাপারে তথ্য পেয়ে আসছিল তারা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস খুনটা রানাই করেছে।

তাদের কথা থেকে এটুকু রানা স্পষ্ট বুঝল, ওর কপাল অত্যন্ত ভাল যে পুলিশ অফিসাররা ওকে দেখেই গুলি শুরু করেনি।

অস্ত্রের মুখে ওয়ালথারটা ছিনিয়ে নিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো রানার হাতে, তোলা হলো গাড়ির পিছনে। একজন অফিসার সামনের সিটে উল্টো হয়ে বসে পিস্তল তাক করে রাখল ওর বুকে।

রানা বুঝতে পারছে ভাল ঝামেলায় পড়ে গেছে ও। তারপরও এক পলকের জন্য চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল: সামান্থা লেইটারের সঙ্গে আজ আর লাঞ্চ করা সম্ভব হবে না।

চোদ্দো

পুলিশ স্টেশনে প্রথমেই রানার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়া হলো না, তার বদলে ওকে ছোট তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। ভাল মতো সার্চ করা হয়নি ওকে, নইলে জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে হত। উরুর সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো গ্যাস বোমাটা এখনও যথাস্থানেই আছে। তবে ওর কাছে স্টিলেটো পাওয়াটা বিরুদ্ধেই যাবে।

দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই ঘরটায়। একটা চেয়ারে বসল রানা। সময়টা ব্যয় করল চিন্তা করে। এখন ও জানে, ও যখন হেইঞ্জের বাড়ির দোতলায় খুঁজছে তখন আসল আততায়ী অথবা তার সঙ্গী পুলিশকে ফোন করেছে। হয়তো ধরে নিয়েছিল ওকে যদি খুন করতে না-ও পারে তবুও হেইঞ্জের খুনি হিসেবে ওকে ধরবে পুলিশ।

কিন্তু কেন? লোকটা যদি কুরিয়ার কিলারই হয়ে থাকে তা হলে কেন সে চাইবে সুইস জেলে পচে মরুক ও? ও জেলে থাকলে কী করে টিউবটা হাতিয়ে নেবে সে? নাকি লোকটা নিশ্চিত ছিল ওকে খুন করতে পারবে? পুলিশকে ফোন করাটা বাড়তি সতর্কতা? টিউবটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ত সে, আর তখনও বেঁচে থাকলে খুনের অভিযোগে ফেঁসে যেত রানা? হেইঞ্জের লুগারটা থেকে কি গুলি করা হয়েছে?

আততায়ীর পিস্তলের নলটা স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ ছিল। ওটাও কি নাইন এমএম ল্যুগার, না সাইলেন্সারের কারণে নলটা অত দীর্ঘ মনে হয়েছিল?

কিছুই নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়ার উপায় নেই। শুরু থেকেই যেন জটিল একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে ও।

রানার চিন্তায় বাধা পড়ল দরজাটা খুলে যাওয়ায়। ও ভেবেছিল ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু বেঁটে এক পুলিশ অফিসার ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন। মাঝবয়স পেরিয়ে গেছেন তিনি, চুলগুলো ধূসর, ছোটখাটো একটা গোলচে ভুঁড়িও আছে। তাঁর হাতে নিজের মানিব্যাগটা দেখতে পেল রানা। পকেট হাতড়ে সিগারের টিউবগুলোর সঙ্গে ওটাও নিয়ে নেয়া হয়েছিল ওর কাছ থেকে।

মানিব্যাগটা কানের কাছে ধরলেন নবাগত অফিসার, ভাব দেখে মনে হলো, তাঁর ধারণা, ওটা তাঁকে অতি গোপন সব তথ্য বলে দেবে। তারপর বললেন, 'আপনি বাংলাদেশি।'

'হ্যাঁ।

'মানিব্যাগে আইডেন্টিফিকেশন বলতে প্রায় তেমন কিছুই নেই, মিস্টার...'

'রানা। মাসুদ রানা।'

রানা এজেন্সির কার্ডটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন অফিসার,

আবার ওটা গুঁজে দিলেন মানিব্যাগে। 'মিস্টার রানা, আমি সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্ল গুস্তাভ, অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

রানা শুকনো গলায় বলল, 'আপনি যখন আমার সার্ভিসে নিয়োজিত তো বের করুন আমাকে এই খুপরি থেকে।'

'সময় আসুক।' ঝকঝকে দাঁত বের করে মেকি হাসি হাসলেন কার্ল গুস্তাভ টেবিলের ওপর মানিব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন। এবার হাত দুটো পিছনে বেঁধে নিয়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। টেবিলের চারপাশে ঘুরছেন রানাকে কেন্দ্র করে। রানার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছেন সেকেন্ড দশেকের জন্য।

'আপনি কি ফ্রেডরিক হেইঞ্জ নামের কাউকে চিনতেন, মিস্টার রানা?'

'না তো!' জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না রানা।

'কিন্তু তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন আপনি।'

'আপনার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ধারণা সঠিক নয়।'

'আমার লোকেরা যখন আপনাকে দেখে তখন কী করছিলেন আপনি?'

'দৌড়াচ্ছিলাম।'

ভ্রূ নাচালেন গুস্তাভ। 'কেন?'

'একজনকে ধাওয়া করছিলাম।'

উৎসাহের ছাপ পড়ল কার্ল গুস্তাভের চেহারায়। 'আচ্ছা! কাকে?'

'একজন লোককে।'

থমকে দাঁড়ালেন গুস্তাভ। 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, মিস্টার রানা?'

'মোটেও না। লোকটা মুখোশ পরা ছিল। মুখোশ যদি না-ও থাকত তা হলেও তাকে আমি চিনতাম কি না সন্দেহ আছে।'

'ও? তা কেন আপনি তাকে ধাওয়া করলেন?' আবার পায়চারি শুরু করলেন গুস্তাভ।

'কারণ সে ফ্রেডরিক হেইঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'কিন্তু আপনি তো বলেছেন আপনি ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে চিনতেন না।'

'অবশ্যই চিনতাম না,' বলল রানা। 'আর যেরকম আচরণ আমার সঙ্গে এখানে করা হচ্ছে এবং যেভাবে আপনি কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে তাঁকে আমার কখনও চেনা হয়ে উঠবে না।'

চক্কর কাটা বন্ধ করে রানার সামনে দাঁড়ালেন গুস্তাভ। 'আপনার আন্দাজ নির্ভুল, মিস্টার রানা। মিস্টার হেইঞ্জ মারা গেছেন। তাঁর বুকে গুলি করা হয়েছিল।'

'তা-ই?' মিথ্যেটা শুনেও চেহারা নির্বিকার রাখল রানা। 'আপনারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখেছেন আমার পিস্তলটা? ওটা থেকে যে তাঁকে গুলি করা হয়নি

সেটা তো এখন নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে।'

হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গিয়ে সরাসরি রানার চোখে তাকালেন গুস্তাভ। 'ক্যালিবারটা মিলে গেছে, মিস্টার রানা। এখন ফরেন্সিক এক্সপার্টরা কী মতামত দেয় তার ওপর নির্ভর করছে আপনি ফেঁসে যাবেন কিনা। বাকি জীবন জেলে কাটাতে হতে পারে আপনাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপাতত আমার শুধু এটুকুই বলার আছে যে ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে যোগাযোগ করতে চাই আমি।'

অবাক হলেন কার্ল গুস্তাভ। 'ওখানে কেন? বাংলাদেশের দূতাবাসে নয় কেন?'

'কারণ আমি ব্রিটিশ সরকারের কাজে এখানে এসেছি।'

কয়েক সেকেন্ড রানাকে দেখলেন গুস্তাভ, তারপর বললেন, 'এম্ব্যাসিতে যোগাযোগের হয়তো দরকার পড়বে না, মিস্টার রানা। আমি মিথ্যে বলছিলাম।'

নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ পড়ল রানার চেহারায়। 'কোন্ ব্যাপারে?'

'ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে গুলি করা হয়নি, গলা কেটে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এবং কাজটা আপনার স্টিলেটো দিয়ে করা হয়নি।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা। 'তা হলে আমাকে এখানে এভাবে আটকে রাখার অর্থ কী?'

'ফ্রেডরিক হেইঞ্জের ওখানে কী করছিলেন আপনি, মিস্টার রানা?'

'এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে মিস্টার হেইঞ্জের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ির কাছে যেতেই গুলি করা হলো আমাকে লক্ষ্য করে।'

'যদিও আপনার ইন্টারন্যাশনাল গান লাইসেন্স আছে, তবুও কাস্টম্স্কে ওটার কথা রিপোর্ট করেননি আপনি। কেন? এবং আমার আরও একটা প্রশ্ন হচ্ছে: পিস্তল এবং স্টিলেটো নিয়ে কেন মিস্টার হেইঞ্জের ওখানে যেতে হলো আপনাকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওগুলো ছাড়া কোথাও যাই না আমি। অভ্যেস বলতে পারেন। আর কাস্টম্স্কে পিস্তলের কথা জানাতে বেমালুম ভুলে গেছি।'

'ও!' কার্ল গুস্তাভের চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ পড়ল। 'কিন্তু মিস্টার রানা, আমরা তো এটা অ্যালাউ করতে পারি না যে বিদেশিরা কোমরে পিস্তল গুঁজে আমাদের রাস্তায় মানুষের পিছু ধাওয়া করবে।'

'ভুলটা আমি একা করিনি,' বলল রানা। 'আগেই বলেছি আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে পালাচ্ছিল একজন।'

'আমার লোকেরাও আরেকজনকে দেখেছে,' কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন গুস্তাভ। 'তবে তার হাতে পিস্তল ছিল কি না তা ওরা বলতে পারেনি। আপনাকে পিস্তলসহ ছুটতে দেখেছে ওরা, কাজেই ওই লোকের পিছু ধাওয়া না করে আপনাকে গ্রেফতার করাই ভাল মনে করেছে। আমি হলেও একই সিদ্ধান্ত নিতাম।'

'সিদ্ধান্তটা নেয়া ভুল হত।' রানা ভাবছে, পুলিশ ওই বাড়ির সামনে কপালে গুলি খাওয়া লোকটার কথা চেপে যাচ্ছে কেন? নাকি পায়নি এরা লাশটা?

রানার চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন কার্ল গুস্তাভ। 'হয়তো।'

'এখন আমাকে নিয়ে কী করবেন ভাবছেন, কোনও একটা কেস ঠুকে কোর্টে চালান দেবেন?'

'না। আপনাকে জিজ্ঞেসাবাদের জন্যে পুলিশী হেফাজতে আনা হয়েছিল, জিজ্ঞেসাবাদ করা হয়েছে।'

ঝামেলা কাটছে ভেবে আশান্বিত হয়ে উঠল রানা। 'তা হলে এখন চলে যেতে পারি আমি?'

'পারেন। তবে শহরের বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না আপনার।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আরেকজনের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।'

'কোথায় থাকে সে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল কার্ল গুস্তাভের।

ঠিকানাটা জানাল রানা। মাথা ঝাঁকালেন গুস্তাভ। 'জায়গাটা শহরের ঠিক বাইরে, তবে আপনাকে আমি ওখানে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।' একটু থেমে বললেন, 'তবে আশা করি ওই লোকও খুন হয়ে যাবে না।'

মানিব্যাগটা পকেটে পুরল রানা।

'আপনি টাকা-পয়সা গুনে নিতে পারেন,' বললেন গুস্তাভ।

'আপনাদের ওপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে,' মৃদু হাসল রানা। 'আমার সিগারগুলোও নিশ্চয়ই ফেরত দেবেন?'

'অবশ্যই।' জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারের টিউবগুলো বের করে বাড়িয়ে দিলেন গুস্তাভ। রানা ওগুলো হাতে নিয়ে দেখল মাত্র পাঁচটা টিউব আছে। ধক্ করে উঠল ওর বুক।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে স্থির গলায় বলল ও, 'এখানে তো পাঁচটা দেখছি, আমার কাছে ছয়টা সিগার ছিল।'

'তাই?' কপালের চামড়া কুঁচকে গেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের। মনে হলো রানার হাতের টিউবগুলো গুনলেন তিনি, তারপর বললেন, 'দেখাই যাচ্ছে পাঁচটা আছে।'

'হ্যাঁ।'

'এ থেকে বোঝা যায় একটা আপনি টেনেছেন,' নিশ্চিন্ত গলায় বললেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'ভুলে গেছেন কথাটা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বলল, 'তাই হবে, হয়তো।' টিউবগুলো জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল ও। একটা টিউবের ঘাটতি নিয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো ঠিক হবে না। অন্তত পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ওগুলোর দিকে মনোযোগ না দেয়াই ভাল। অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল ও। 'আমার স্টিলেটো আর পিস্তলটা নিশ্চয়ই ফেরত দিচ্ছেন?'

'না, দুঃখিত। ওগুলো আমাদের হেফাজতেই রাখব আমরা।'

'পিস্তলটা আটকে রাখার কারণ জানতে পারি? আমার তো ওটা এদেশে ক্যারি করার লাইসেন্স আছে।'

‘পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে না আমাদের দেশে, মিস্টার রানা।’ গর্ব প্রকাশ পেল পুলিশ অফিসারের কণ্ঠে। ‘কেন আপনাকে পিস্তল ফেরত দেব তার একটা কারণও কি দেখাতে পারবেন?’ স্থির দৃষ্টিতে রানাকে দেখছেন কার্ল গুস্তাভ। ‘ইচ্ছে করলেই ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে এমন ব্যবস্থা নিতে পারি যাতে এদেশে ওটা আপনি সঙ্গে রাখতে না পারেন, সেটা জানেন?

এক মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বলল, ‘আপনাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব এমন কোনও কারণ আমার জানা নেই বোধহয়। বিশেষত, একজন লোক খুন হয়ে যাওয়া, তারপর আমার দিকে গুলি করে আরেকজনের পালিয়ে যাওয়া যখন আপনার কাছে খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলে মনে হচ্ছে— আমার কিছুই বলার নেই। আর হ্যাঁ, আমি জানি, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলেই এদেশে আমার লাইসেন্সটার ভ্যালিডিটি বাতিল করতে পারে।’

তৃপ্তির সঙ্গে মাথা দোলালেন গুস্তাভ। ‘কাজেই পিস্তলটা আমরা রেখে দিচ্ছি।’

‘এদেশ ছাড়ার সময় ওটা ফেরত পাব নিশ্চয়ই?’

‘বলা যায় না। জানতে পারি, কেন আপনি পিস্তল বহন করছিলেন?’

‘আত্মরক্ষার জন্যে।’

‘কার কাছ থেকে?’

মেজাজ খিঁচড়াতে শুরু করল রানার। ‘খারাপ লোকদের কাছ থেকে। আপনার কি ধারণা, ফ্রেডরিক হেইঞ্জ খুন হয়ে যাননি?’

কথাটা শুনে একটু থম মেরে গেলেন কার্ল গুস্তাভ। ‘আপনার কথায় যুক্তি একেবারেই নেই তা বলতে পারছি না। তবে এ-ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে চাই না আমি। সুইটযারল্যান্ড থেকে চলে যাবার আগে যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে, তখন আপনার স্টিলেটো আর পিস্তলটা ফেরত দেয়া হবে কি হবে না সে-ব্যাপারে কথা বলব আমরা, ঠিক আছে?’

‘বেশ।’

হাত বাড়িয়ে দরজা দেখালেন রানাকে কার্ল গুস্তাভ। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। গুস্তাভ উদার গলায় বললেন, ‘যেতে পারেন আপনি, তবে মনে রাখবেন, শহর থেকে বেরিয়ে কোথাও গেলে কিংবা দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।’

‘কথাটা আমার মনে থাকবে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুস্তাভ,’ রাগ চেপে শান্ত স্বরে বলল রানা।

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল ও, বামে বাঁক নিল, তারপর স্টেশন থেকে ওকে আর দেখা যাবে না বুঝে পকেট থেকে বের করল সিগারের সিল করা টিউবগুলো। তার মানে খোলা হয়নি ওগুলো। কিন্তু পাঁচটা... একটা টিউব অন্যগুলোর চেয়ে সামান্য দীর্ঘ দেখে স্বস্তির বিরাট একটা শ্বাস ফেলল ও। একটা সিগার যে-ই মেরে দিয়ে থাকুক, ওর পয়সায় মজা করে অত্যন্ত দামি ধোঁয়া টেনেছে সে।

এখন ওয়ালথারটা ফেরত পাওয়া দরকার। ওটা ছাড়া নিজেকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত মনে হবে ওর। কুরিয়ার কিলার যদি হামলা করে তা হলে খালি হাতে কিছুই করতে পারবে না ও। গ্যাস বোমাটা ব্যবহারের সুযোগই পাবে না লোকটা কাছাকাছি না এলে।

ট্যাক্সি নিল রানা, ড্রাইভারকে ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে যেতে বলল।

পনেরো

আধঘণ্টা পর। ব্রিটিশ এম্ব্যাসি। ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারের অফিসে রাশভারী ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে আছে রানা, মিনিটখানেকও হয়নি ঢুকেছে।

'কী করতে পারি আমি আপনার জন্যে, মিস্টার রানা?' সিগারেট অফার করে অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার। ইতিমধ্যেই তাঁর জানা হয়ে গেছে বিএসএস-এর বিশেষ জরুরি একটা কাজ নিয়ে এদেশে এসেছে ও। তবে কথাটা তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করেননি। সম্ভবত কূটনৈতিক সতর্কতা। 'জেনেভা মেট্রোপলিটান পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্ল গুস্তাভ ফোন করেছিলেন এই খানিক আগে। জানতে চাইলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক তাঁর দেশে কী করছে।'

রানা এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জানল কী করে যে আমি বিএসএস-এর কাজে এসেছি?'

'আন্দাজ করে নিয়েছে, যখন আপনি আমাদের এম্ব্যাসিতে যোগাযোগ করতে চাইলেন, তখনই।'

'বুদ্ধিমান লোক।' ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারকে মার্ভিন লংফেলোর অফিসের বিশেষ ফোন নম্বর দিল রানা। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'আমি হোটেল জেনোয়াতে পাঁচশো বত্রিশ নম্বর রুমে আছি। ঘণ্টাখানেক পর ওখানে খোঁজ করলে আমাকে পাবেন। ফোনে আলাপ সেরে আমার পিস্তল আর স্টিলেটো ফেরত পাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন আশা করছি।'

'সহজ হবে না কাজটা।' রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করেছেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার। রানা উঠে পড়েছে দেখে বললেন, 'গুডবাই, মিস্টার রানা। আপনাকে যদি বিএসএস ক্ল্যারিফাই করে তা হলে আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সবকিছুই করব আমরা আপনার জন্যে।'

'গুডবাই।' অফিসটা থেকে বের হয়ে এলো রানা, এম্ব্যাসি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল। হোটেলে ফিরে সোজা নিজের ঘরে চলে এলো ও। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। নক করল সামান্থার ঘরে যাবার কানেকটিং দরজায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কোনও সাড়া নেই। তার মানে ঘরে নেই সামান্থা, খুঁজে বের করতে হবে তাকে। খিদে চেপে গোসল করতে ঢুকল রানা, পনেরো মিনিট ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার পর মনে হলো যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। কোমরে তোয়ালে

জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল ওর বিছানার কিনারায় বসে আছে সামান্থা। রানাকে দেখে চোখ সরু করে তাকাল। চোখে রাগ।

'দাঁড়াও, আগেই ঝগড়া শুরু কোরো না,' বলল রানা। 'আগে শোনো কী ঘটেছে।'

'কী ঘটেছে?' ভুরু কোঁচকাল সামান্থা। 'বলো শুনি। আড়াই ঘণ্টা আমি তোমার অপেক্ষায় ডাইনিং রুমে বসে ছিলাম। প্রতিটা মুহূর্ত নিজেকে বুঝ দিতে চেষ্টা করেছি তুমি কেটে পড়োনি।'

'এখন তো জানো ওরকম কিছু আমি করিনি।'

'হ্যাঁ, এখন, এতক্ষণ পরে জানছি।' রানার চোখের দিকে তাকাল সামান্থা। কথায় এখনও ঝাঁঝ। 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান একটু কম বলে মনে হচ্ছে। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার, কোনও বিপদে পড়লে কিনা।'

'খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'তবে দেখতেই পাচ্ছ, এখনও খুন হয়ে যাইনি।'

'মানে?' মেরুদণ্ড সোজা করে বসল সামান্থা। 'খুন করতে চেষ্টা করেছিল? কে!'

'বলছি, আগে কাপড় পরে নিই।' তৈরি হয়ে নিতে মিনিট পাঁচেক লাগল রানার। 'চলো, খেতে খেতে বলব সব।'

'আমি পোশাক পাল্টে আসছি,' বলল সামান্থা। 'তবে মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাকবে, যাতে আবার তুমি আমাকে ফেলে চলে যেতে না পারো।'

'তোমাকে ফেলে চলে যাবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই,' সত্যি কথাই বলল রানা।

বাঁকা চোখে ওকে দেখল সামান্থা, তারপর লোভনীয় ভঙ্গিতে সুডৌল নিতম্ব দুলিয়ে রওনা হলো নিজের ঘরের দিকে। মরাল গ্রীবা ফিরিয়ে রানাকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে ঢুকে গেল ঘরে, দরজাটা খোলাই থাকল। নীরব আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করল রানা, সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষায় থাকল। পরপর তিনটে সিগারেট শেষ করল ও। পুরো আধঘণ্টা পর ফিরল সামান্থা। রানার দিকে তাকাল, মায়াবী বাদামি চোখগুলোয় খানিকটা বিভ্রান্তি। 'চলো, যাওয়া যাক।'

অনেক দেরিতে আজ লাঞ্চে বসল ওরা হোটেলের ডাইনিং রুমে। ওয়েইটাররা ছাড়া গোটা হলঘর ফাঁকা।

সকালের পর থেকে কী কী ঘটেছে সামান্থাকে যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে বলল রানা।

ধাওয়ার প্রসঙ্গে আসতেই সামান্থা বলল, 'ক্রাইস্ট! তোমার কপাল ভাল যে পুলিশ তোমাকে তখনই গুলি করে মেরে ফেলেনি!'

'চিন্তাটা দুয়েকবার আমার মাথাতেও আসেনি, তা নয়,' বলল রানা। 'খুপরির মতো একটা ঘরে আমাকে আটকে রেখেছিল ওরা, তখন অনেক কথাই ভেবেছি।'

হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠল সামান্থার সোনালী গাল দুটো। 'আমার কথা কি ভেবেছ একবারও?'

'হ্যাঁ,' সরাসরি মেয়েটার চোখে তাকিয়ে মিথ্যে বলল রানা। কখনও কখনও মিথ্যেটা সত্যির চেয়ে অনেক বেশি কাম্য।

চোখ নামিয়ে নিল সামান্থা। 'ডেযার্টের পর কী করবে ভাবছ?'

'আরেকজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার বলে মনে করছি। তবে এখনও ঠিক করিনি আজই তার ওখানে যাব কি না।'

'সে-ও খুন হয়ে যায়নি তো?'

'সম্ভাবনা একেবারে নেই তা নয়।' ডেযার্ট শেষ করে ওয়েইটারকে ডাকল রানা, বিল মিটিয়ে দিল।

ওয়েইটার চলে যাবার পর সামান্থা জিজ্ঞেস করল, 'যদি সে-ও মারা গিয়ে থাকে, তা হলে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল রানা, তারপর বলল, 'ও নিয়ে আগামীকাল চিন্তা করা যাবে। আজ আর কাজ নয়, শুধু বিশ্রাম।'

'রাতে কী করবে ভাবছ?' প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সামান্থা। চট করে রানার চোখে একবার তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

চেয়ার ছাড়ল রানা, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সামান্থাকে, তারপর বলল, 'ঘরে যাওয়া যাক, চলো। ওখানে দুজন মিলে ভাবা যাবে আজকের অবসরে কী করব আমরা।'

'কার ঘরে বসে ভাবব আমরা?' রানার হাতের কব্জি চলে গেল সামান্থার লাল নেইলপলিশ করা আঙুলগুলোর দখলে। অল্প অল্প কাঁপছে সামান্থার উষ্ণ হাত।

'তোমার ঘরে,' নির্দ্বিধায় বলল রানা।

রানাকে পাশে নিয়ে পা বাড়াল সামান্থা। সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ দেবতার দয়া হলো যে?'

মৃদু হাসল রানা। 'দেবতা নই, আমি রীতিমতো ভিতু একজন সাধারণ মানুষ। ওরা আমার পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে, একা থাকি কী করে রাতে? ভয় লাগবে না? কাজেই ভাবছি রাতটা তোমার সঙ্গেই কাটাই।'

'আচ্ছা!' হাঁটার গতি দ্রুত হলো সামান্থার।

ষোলো

সকালে সামান্থার ঘরেই নাস্তা আনিয়ে খেল ওরা, তারপর রানা চলে এলো নিজের ঘরে। সামান্থা আর ও ঠিক করেছে গোসল সেরে তৈরি হয়ে আধঘণ্টার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবে।

রানা বাথরুমে ঢোকার আগেই ফোন বেজে উঠল। ব্রিটিশ এম্ব্যাসি থেকে কল করা হয়েছে। ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার খোঁজ নিয়ে জেনেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে জেনেভায় এসেছে রানা। তবে হতাশ হলো ও ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারের কথা শুনে। পিস্তল ফিরিয়ে দিতে এখনও কার্ল গুস্তাভকে রাজি

করাতে পারেননি উনি। জানালেন হাল ছাড়বেন না, আরও ওপরে যোগাযোগ করবেন, প্রয়োজনে ব্রিটেনে যোগাযোগ করে রানার জন্য ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ইস্যু করাবেন, যাতে ওর পক্ষে সঙ্গে অস্ত্র রাখা সম্ভব হয়।

দুজনের কারও আর কোনও কথা না থাকায় ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল রানা।

'এবার কী করব আমরা?' পঁচিশ মিনিট পর করিডরে বেরিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল সামান্থা।

'গাড়ি ভাড়া নিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কী?'

মাথায় টোকা দিল রানা। 'ঠিকানাটা এখানেই আছে, চিন্তা কোরো না।'

লবিতে নেমে ডেস্ক ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল রানা কাছের কার রেন্টাল এজেন্সিটা কোথায়। ঠিকানা জেনে নিয়ে সামান্থাকে বলল, 'অফিসটা সামান্য দূরে, চলো হেঁটেই যাওয়া যাক।'

'ভাল লাগবে আমারও সকালের হালকা রোদে হাঁটতে,' বলল সামান্থা।

হোটেল থেকে বেরোবার আগেই চিন্তাটা খেলে গেল রানার মাথায়, রাস্তায় বের হলেই যদি কুরিয়ার কিলার গুলি করে ওদের ফেলে দেয়; তা হলে কিছুই করার নেই ওর। সামান্থার কাছে অবশ্য ওর ·২৫ বেরেটা পিস্তলটা আছে। ওটাকে একটা খেলনা বললেও খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না। তবুও যতো নগণ্যই হোক, একটা অস্ত্র তো বটে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

সামান্থার কথায় চিন্তায় বাধা পড়ল ওর। 'তুমি শহর থেকে বের হলে পুলিশের কোনও আপত্তি নেই তো? তাদের অনুমতি নিয়ে নিয়েছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'কী হত যদি পুলিশ তোমাকে বিএসএস-এর লোক মনে না করত?'

'তা হলে হয়তো আগামী বেশ কিছুদিনের জন্যে আটকে দিত,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সামান্থা। 'আর আমি ভাবতাম আমাকে ফেলে পালিয়েছ তুমি।'

এবার কথাটা পাড়ল রানা। 'সঙ্গে তোমার পিস্তলটা আছে, সামান্থা?'

'পিস্তল?' চমকে গেল সামান্থা। 'আমার কাছে পিস্তল আছে সেটা...'

'জানব না কেন, ওটা কে পরিষ্কার করে রেখেছে বলে তোমার ধারণা?'

'পরিষ্কার করে রেখেছ?' থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সামান্থা। 'আসলে ওটা আমি ব্যাগ থেকে বের করে দেখিনি।'

'পার্সে আছে?'

ব্যাগটা খুলল সামান্থা, মুখ নিচু করে দেখল অস্ত্রটা সত্যিই আছে কি না। 'হ্যাঁ, আছে।'

'ব্যবহার করতে জানো?'

'গুলি করতে পারব,' বলল সামান্থা। 'তবে গুলিটা কোথায় গিয়ে লাগবে সেটা শুধু ঈশ্বর বলতে পারবেন!'

'তা হলে ওটা আমার হাতে দাও।' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

কেউ যাতে দেখতে না পায় সেজন্য শরীর দিয়ে আড়াল করে ছোট্ট পিস্তলটা বের করল সামান্থা, রানার হাতে দিল। কোটের পকেটে ·২৫ বেরেটা অটোমেটিকটা রেখে দিল ও।

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা, হাঁটতে শুরু করল। আট মিনিটের মাথায় কার রেন্টাল এজেন্সির অফিসে পৌঁছে গেল দু'জন।

একটা ফিয়াট ভাড়া করল রানা। কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ডক্টর হপকিন্সের পরিচিত লোকটা যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে।

রওনা হয়ে বারবার রিয়ারভিউ মিররে চোখ বুলাচ্ছে রানা, যদিও কারও অনুসরণ করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবু একটা চিন্তা বারবার ঘুরেফিরে আসছে, ওর আগেই রালফ হফম্যানের কাছে পৌঁছে যায়নি তো খুনি? আগেরবার কী করে ফ্রেডরিক হেইঞ্জের ওখানে খুনি গিয়েছিল তা নিয়ে ভেবেছে ও। সিদ্ধান্তে এসেছে, অকল্পনীয় মনে হলেও খুনি আগে থেকে হেইঞ্জের ঠিকানা জানতে পারবে শুধুমাত্র বিএসএস-এর নিরাপদ লাইনে ছারপোকা বসানো থাকলে। সোজা কথায়, মার্ভিন লংফেলোর গোপন নম্বরেও আড়িপাতা হয়েছে। এবং সেটা শুধুমাত্র সম্ভব বিএসএস-এর ভিতরের কেউ কাজটা করে থাকলে। ধরে নেয়া যায় যে, রেমন হিউবার্ট মারা গেলেও বিএসএস-এর ভিতরে আরও বিশ্বাসঘাতক আছে।

'বারবার রিয়ারভিউ মিররে তাকাচ্ছ তুমি,' ফিরে তাকিয়ে বলল সামান্থা।

'অভ্যেস।'

চুপচাপ কী যেন ভাবল সামান্থা, রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটু পর নরম গলায় বলল, 'রানা, তুমি কি পারো না এরকম বিপজ্জনক জীবন থেকে সাধারণ শান্তিময় ঘরোয়া জীবনে ফিরে যেতে, এসপিয়োনাজ ছেড়ে দিয়ে সংসারে মন দিতে?'

'কেউ পারে, কেউ পারে না,' বলল রানা। 'তোমার বাবাও পারেননি। আমিও বোধহয় পারব না।'

'এবং বাবা খুন হয়ে গেছে,' বলল গম্ভীর সামান্থা। 'তুমিও খুন হয়ে যেতে পারো যখন তখন। তোমার স্ত্রীকে সবসময় শঙ্কার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে, সর্বক্ষণ ও আতঙ্কে থাকবে, এই বুঝি খবর এলো ওর স্বামী আর নেই।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, কই, কত মেয়েই তো এলো আমার জীবনে—সুলতা, সোহানা, রেবেকা—আরও কত, কিন্তু ঘর বাঁধতে শেষ পর্যন্ত পারলাম কই! কেউ ঝরে গেছে অকালে, কেউ বা সরে গেছে আমাকে বাঁধতে পারবে না বুঝতে পেরে। নিয়তি আমাকে একা করেছে বারবার, একাই পথ চলেছি, চলতে হয়েছে বলে। কিন্তু চুপ করে থাকল রানা।

বিশ মিনিট পর নীরবতা ভাঙল সামান্থা। 'আর কতদূর, রানা?'

'তিন ভাগের এক ভাগ এসেছি,' জানাল রানা।

ওদের সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ কালো হাইওয়ে, দু'পাশে ফাঁকা জমি।

জায়গাটা অ্যাম্বুশের জন্য আদর্শ। দ্রুত ছুটছে ফিয়াট। এক সময় অনেক দূরে দু'পাশে বাড়ি-ঘরের আভাস দেখা গেল। আস্তে আস্তে কাছিয়ে আসছে জনপদ। পনেরো মিনিট পর ছোট একটা গ্রামে ঢুকল ফিয়াট।

'এসে গেছি?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা।

'হ্যাঁ, এবার ঠিক রাস্তাটা খুঁজে বের করতে হবে।' বাড়িগুলোর নম্বর দেখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কথা মনে পড়ে গেল রানার। কোনও পারম্পর্য নেই নম্বরে। রালফ হফম্যানের বাড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। একটা পেস্ট্রি শপের সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল ও।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে হাসিখুশি এক লোক। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানাল কোন্ পথে যেতে হবে। রালফ হফম্যানের বাড়িটা ঠিক গ্রামের ভির্তর নয়, বেশ খানিকটা বাইরে, একটা খামারবাড়ি। রানা বিদায় নেবার আগে ধন্যবাদ জানাতেই সে বলল, 'রালফ আজকাল বদলে গেছে মনে হচ্ছে। ভাল। মানুষের সঙ্গে মেশা উচিত। আপনিও কি ওর বন্ধু?'

বিপদের ঘণ্টি বেজে উঠল রানার মগজের ভেতর। 'হঠাৎ কথাটা বললেন যে, আগে সে কারও সঙ্গে মিশত না?'

'একেবারেই না,' হাসল লোকটা। 'অথচ এই তো কাল দুপুরেই আমার কাছে ওর বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল একজন, বলল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রালফের ওখানেই রয়ে গেছে বোধহয় সে, রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা রেখেছিলাম, আমি তাকে ফিরতে দেখিনি।'

'অন্য কোনও পথে...

মাথা নাড়ল দোকানী। 'এটাই ওখানে যাওয়া-আসার একমাত্র পথ।'

'একাই ছিল লোকটা?' শঙ্কিত বোধ করছে রানা।

'হ্যাঁ।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' দ্রুত পায়ে ফিরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল রানা, দেরি না করে রওনা হয়ে গেল।

'কী হয়েছে?' রানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করল সামান্থা। 'খারাপ কিছু?'

ওপর-নীচে মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের আগেই পৌঁছে গেছে কেউ একজন। আমি সম্ভবত জানি ওখানে গিয়ে কী দেখতে পাবো।'

সতেরো

'ফার্ম?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা।

'হ্যাঁ।' গাড়িটা গেটের সামনে থামাল রানা। নামতে হবে ওকে গেট খুলতে। কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিরাট উঠানের ওপাশে খামারবাড়িটা।

'সাবধান,' রানা নামতেই বলল সামান্থা।

বামহাতে হুক খুলল রানা। ধাক্কা দিতেই ভেতরের দিকে সরে গেল পাল্লা দুটো। গাড়িতে উঠতেই সামান্থা বলল, 'কিছু ঘটবে ভাবছ?'

'সতর্কতা,' বলল রানা। 'তুমি সঙ্গে না থাকলে স্বস্তি পেতাম।'

বাড়িটার সামনে থামল রানা। কাঠের তৈরি ছোট, পুরনো বাড়ি, কিন্তু যত্ন নেয়া হয়। সদ্য সাদা রং করা হয়েছে। বার্নটার অবস্থা অবশ্য তেমন ভাল নয়, বোধহয় ওটা মেরামতের টাকা নেই হফম্যানের। ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলল রানা। 'তুমি গাড়িতেই থাকো।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল সামান্থা। 'বরং তোমার সঙ্গে থাকলেই অনেক নিরাপদে থাকব আমি।'

'আসতে পারো,' বলল রানা, 'কিন্তু আমার কথার বাইরে এক পা-ও ফেলতে পারবে না।'

'ঠিক আছে।'

নামল ওরা। পিস্তলটা হাতে নিয়ে রানা বলল, 'আমার যদি কিছু হয় তা হলে দেরি না করে পালাতে চেষ্টা করবে, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।' সামান্থার চেহারায় স্পষ্ট অনিচ্ছা।

'চলো তা হলে।'

বার্নের দিকে একটা চোখ রেখে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠল রানা। বার্নটা হাতের ডানদিকে, কাজেই সামান্থাকে রেখেছে ও বাম পাশে। দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে উঠল ও বাড়ির দরজাটা খোলা দেখে। হাতের ইশারায় সামান্থাকে বারান্দাতেই একটা পিলারের আড়ালে থাকতে বলে সাবধানে ঢুকল ও ভেতরে।

'রানা?' বাইরে থেকে ফিসফিস করল সামান্থা।

বিরক্ত হলো রানা, সাড়া না দিলে সামান্থা ডাকতেই থাকবে। দরজা দিয়ে বামহাতটা বের করে দিল ও, যাতে মেয়েটা ওর হাত ধরে পিছনে চলে আসতে পারে।

সামান্থা ঢুকতেই ঠোঁটে আঙুল দিল ও। 'একদম চুপ।'

বাড়ির ভিতরটা প্রায় অন্ধকার, ঠিক যেমন ছিল হেইঞ্জের বাড়িতে। রানার মন বলছে এখানেও ওরকম কোনও দৃশ্যই অপেক্ষা করছে ওর জন্য। দূর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির একটা আওয়াজ শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও।

'কী?' ফিসফিস করল সামান্থা।

দরজার কাছে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। 'বার্নে কেউ একজন আছে।'

'বুঝলে কী করে? কে থাকবে ওখানে?'

'সম্ভবত খুনি। হেইঞ্জের বাড়িতে আমি যখন দোতলায় খুঁজছি সে তখন একতলায় ছিল, অপেক্ষা করছিল কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আমাকে শেষ করার জন্যে।'

'কিন্তু এ-বাড়িতে তো দোতলা নেই।'

'কাজেই বার্নে অপেক্ষা করছে সে।'

'আর যার কাছে এসেছি, সে? সে কোথায়?'

‘বার্নের লোকটা যদি খুনি হয়ে থাকে তা হলে হফম্যান এখন মরে পড়ে আছে।’

‘সবগুলো ঘর ঘুরে তাকে খুঁজবে না কি?’

‘হ্যাঁ। তুমি এখানেই দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকো।’ সামান্থার হাতে বেরেটা পিস্তলটা গুঁজে দিল রানা।

‘বার্ন থেকে বেরিয়ে এখানে যদি ঢুকতে চায় লোকটা, তা হলে আমি কী করব?’ গলা কেঁপে গেল সামান্থার।

‘কাছে আসতে দেবে,’ বলল রানা, ‘তারপর বুক লক্ষ্য করে গুলি করবে। দ্বিধা করতে যেয়ো না, মনে রেখো, তোমাকে খুন করতে একটুও বাধবে না তার।’

‘আ-আচ্ছা।’

‘বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।’ সামান্থার কাঁধে চাপ দিয়ে লিভিংরুম পেরিয়ে এগোল রানা, ঊরুর সঙ্গে ঝুলন্ত গ্যাস বোমাটা চলে এসেছে ওর হাতে। বিপদ ঘটলে ওটাই এখন ভরসা।

সামনেই করিডর। পাশাপাশি দুটো বেডরুম আর দু'পাশে দুটো বাথরুমের দরজা দেখতে পেল ও। বাথরুমগুলো ঘুরে দেখল। কেউ নেই। এবার ডানদিকের বেডরুমের দরজা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। ঘরটা খালি। ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সার্চ করল পুরো ঘর। ট্র্যাশ বাকেটে পাওয়া গেল কয়েকটা মুচড়ানো কাগজের বল। খুলে দেখল ওগুলো। স্কেচ আছে কয়েকটা। কাগজগুলো রেখে দিল পকেটে। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

দ্বিতীয় বেডরুমে পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত লাশ। গলা কেটে খুন করা হয়নি একে, বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। লাশের পাশে পড়ে আছে একটা নাইন এমএম ল্যুগার। ওটা তুলে পরীক্ষা করে দেখল রানা। ম্যাগাযিনে তিনটে গুলি কম। নলটা শুঁকল। নলে পোড়া বারুদের গন্ধ। অস্ত্রটা থেকে গুলি করা হয়েছে। পিছনে হালকা আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

নির্দেশ না মেনে চলে এসেছে সামান্থা, দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তচিৎকার করল।

‘গলা কেটে মারা হয়নি বলে অতটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হলো না তোমাকে,’ শুকনো গলায় বলল রানা।

‘ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে...’

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল রানা।

‘বাবাকেও কি...’

‘হ্যাঁ। দুঃখিত, সামান্থা।’ সামান্থার হাত থেকে অস্ত্রটা নিল রানা। ‘বার্নে যাচ্ছি আমি। এখানেই অপেক্ষা করবে তুমি।’

‘কিন্তু...’

‘এখানেই অপেক্ষা করবে তুমি,’ খানিকটা কড়া শোনাল এবার রানার গলা।

ওর চোখের দিকে তাকাল সামান্থা, বুঝে গেল তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ও। ‘ঠিক আছে, এখানেই থাকব আমি।’

দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বার্নের দরজাটা দেখল রানা। তিরিশ ফুট হবে ওটার দূরত্ব। কিন্তু দৌড় দিলে ওখানে পৌঁছানোর আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ও, সেই সম্ভাবনাই বেশি। গাড়িটার ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। গাড়ি থেকে নামার সময় ওর দিকের দরজা লক করেনি ও। যদি এক ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে, তারপর ওটা নিয়ে যদি ঢুকে পড়ে বার্নের দরজা দিয়ে? আততায়ী গুলি করলেও ওর আহত হবার সম্ভাবনা কম। ড্যাশবোর্ডের আড়ালে মাথা নিচু করে গাড়ি চালাবে ও। সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতেই দেরি করল না রানা, ক্ষিপ্র চিতার মতো ছুটল ফিয়াটের দিকে। আট সেকেন্ডের মাথায় দরজা খুলে ঢুকে পড়ল গাড়িতে। একটা গুলিও করা হয়নি ওকে লক্ষ্য করে।

আততায়ী আরও ভাল সুযোগের অপেক্ষা করছে?

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মাথা সামান্য উঁচু করে বার্নের দরজাটা একবার দেখে নিল রানা, তারপর গিয়ার দিয়ে ছুটল চওড়া দরজাটার দিকে। ফিয়াটের কাছ থেকে সবটুকু শক্তি নিংড়ে নিচ্ছে। বিশ ফুট পেরোনোর আগেই তিরিশ মাইল স্পিড তুলে ফেলল ও। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো বার্নের ভেতর ঢুকল ফিয়াট। কড়া ব্রেক কষে গাড়ি থামাল রানা। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে থামার কারণেই হয়তো বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। বার্নের ভেতর ধুলোর একটা ঝড় তৈরি হয়েছে। সুযোগটা নিল ও, ছিটকে বেরিয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল। দশ ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না বদ্ধ জায়গায় ওড়া পুরু ধুলোর কারণে। বার্নের দোতলায় ওঠার নড়বড়ে কাঠের মইটা দেখতে পেল ও ধুলোর ভেতর দিয়ে।

ধুলো আস্তে আস্তে নামছে। বার্নের ভেতর একটা রেনো দেখতে পেল ও, ওটার মুখ দরজার দিকে তাক করা। সম্ভবত ওটাতে করেই এসেছে আততায়ী।

এখন কোথায় ওঁৎ পেতে আছে সে?

আবার কাতর গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। শব্দটা আসছে বার্নের দোতলা থেকে। লোকটা হফম্যানের গুলিতে আহত হয়েছে?

সাবধানে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। দোতলায় ওঠার চৌকো ফাঁকটার সামনে ক্ষণিকের জন্য থামল ও। মইয়ের আরেকটা ধাপ উঠলেই ওর মাথা দেখা যাবে ওপর থেকে। এই সুযোগের জন্যই কি অপেক্ষা করে আছে আততায়ী?

অজান্তেই শ্বাস আটকে ফেলল রানা, পরমুহূর্তে একবারে তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ঝাঁপ দিল দোতলার মেঝেতে। কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হলো ওর শরীর। স্প্রিঙের মতো ছিটকে সিধে হলো রানা। লফটের জানালা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে ভেতরে। ধুলোও নেই এখানে। খড়ের গাদার পাশে ঠেস দিয়ে লোকটাকে বসে থাকতে দেখল রানা, মুখটা অন্যদিকে ফেরানো। মাথাটা ঝুলে আছে বুকের কাছে। কোলের ওপর রক্তাক্ত ল্যুগারটা রাখা। মেঝেতে কালচে রক্ত থকথক করছে। তার মধ্যে পড়ে আছে এক গাদা রক্তাক্ত তুলো। ওগুলোর কারণেই ফার্মহাউসের মেঝেতে লোকটার রক্তের দাগ চোখে পড়েনি ওদের।

দুর্বল স্বরে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। দু'হাতে পেট চেপে ধরে আছে।

এটা ভান হতে পারে না। গুলি করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও ওর দিকে ফেরেনি সে, গুলি করেনি।

লোকটার কোল থেকে ল্যুগারটা তুলে নিল রানা। থুতনি ধরে আহত লোকটার মুখ তুলে ধরে চমকে গেল। বিএসএস-এর এজেন্ট মিকি উইলিস! রানার চোখেই তাকিয়ে আছে সে ঘোলা দৃষ্টিতে। পেটে তিনটে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে তার। হফম্যানের গুলি তার পাকস্থলি ফুটো করেছে তিন জায়গায়। আঘাতটা পেটে বলেই এখনও মরেনি সে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। দুর্বলতার কারণে ফিরে যেতে পারেনি। এখানে উঠে এসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

'উইলিস, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জবাবে গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

'উইলিস, আমি মাসুদ রানা।'

'জানি,' ফিসফিস করল বিএসএস-এর বিশ্বাসঘাতক এজেন্ট। 'জানতাম তুমি আসবে। দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে!'

'আর কারা তোমার সঙ্গে জড়িত?'

'আমরা...' মাথাটা কাত হয়ে গেল মিকি উইলিসের। বড় করে শ্বাস নিল সে। পেটের ফুটো তিনটে দিয়ে রক্তের সরু ধারা বের হলো। 'শালার বে...' ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। পেট খামচে ধরল, তারপর হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে ঘুমাচ্ছে।

মারা গেছে মিকি উইলিস। আর কখনোই মুখ খুলবে না সে। তাকে প্রশ্ন করে জানার কোনও উপায় নেই আর কে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিএসএস-এর সঙ্গে।

নীচ থেকে পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পেল রানা। আরও কেউ ছিল উইলস-এর সঙ্গে? হতে পারে না। থাকলে উইলসকে এভাবে অসহায় অবস্থায় মরতে হত না। চৌকো ফাঁক থেকে সাবধানে নীচে উঁকি দিল রানা।

'গুলি কোরো না!' আঁৎকে উঠল সামান্থা। 'আমি!'

'তোমাকে আমি অপেক্ষা করতে বলেছিলাম,' রাগ চেপে বলল রানা।

'লাশের সঙ্গে ও-বাড়িতে থাকতে ভীষণ ভয় করছিল আমার,' সরল স্বীকারোক্তি দিল সামান্থা।

'নীচেই থাকো,' বলল রানা। 'এখানেও লাশ আছে।' সামান্থাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সরে এলো ও, উইলিসকে চিৎ করে শুইয়ে সার্চ করল, যদিও জানে জরুরি কোনও তথ্য পাবে সে-সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। একটা ক্ষুর আর স্টান গ্যাসের আধখালি একটা ছোট ক্যানিস্টার পেল ও লোকটার প্যান্টের পকেটে। স্টান গ্যাস প্রয়োগ করে বোধহয় ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে সাময়িক ভাবে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল উইলিস, তারপর ক্ষুরটা দিয়ে গলা কাটে। রালফ হফম্যানের বেলায় সেই সুযোগ পায়নি। আগাপাশতলা সার্চ করেও পাওয়া গেল না আর কিছু। নীচে নেমে এলো ও।

'আমরা কি পুলিশকে জানাব?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা।

মাথা নাড়ল রানা। 'আবার পুলিশী ঝামেলায় জড়াতে চাই না। হোটেলে ফিরে ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে ফোন করব। ওরা ক্লিনআপ ক্রু পাঠিয়ে এখান থেকে লাশ দুটো সরানোর ব্যবস্থা করবে। ভুলে যাও আমরা এখানে আদৌ এসেছিলাম।'

'ডক্টর হপকিন্সকে এখানেও পেলে না,' বলল সামান্থা।

'পাইনি,' বলল রানা, 'তবে এখানে এসেছিলেন উনি। কয়েকটা স্কেচ পেয়েছি।' গাড়ির দিকে পা বাড়াল ও। 'চলো, যাওয়া যাক।' একটা চিন্তা মনে আসায় মনটা খচ্‌খচ্‌ করছে ওর।

বিরাট আকারের বার্নে ফিয়াট ঘোরাতে কোনও অসুবিধে হলো না, ফার্মের গেট খোলা রেখেই বেরিয়ে এলো ওরা। সোজা ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল রানা। থমথম করছে ওর চেহারা।

আঠারো

গাড়িটা রেন্টাল এজেন্সিতে ফিরিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল ওদের। এলিভেটরে উঠে রানা বলল, 'লাঞ্চটা ঘরেই করা যাক, কী বলো, সামান্থা?'

'ঠিক আছে,' ক্লান্ত শোনাল সামান্থার গলা। 'তবে আগে গোসল করব আমি।'

'করে এসো, আমি অর্ডার দিচ্ছি।' সামান্থার হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল রানা। 'মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাক।' রুম সার্ভিসে যোগাযোগ করে আধঘণ্টা পর লাঞ্চ আনার জন্য অর্ডার দিল ও, গোসল করতে ঢুকল বাথরুমে। শাওয়ার ছেড়ে ভাবতে শুরু করল: ডক্টর অলিভার হপকিন্স সব সময় ওর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকছেন কী করে। খুনি না হয় বিএসএস-এর মাধ্যমে পাওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আগেই আক্রমণ শানিয়েছে, কিন্তু একজন বিজ্ঞানী কী করে ওকে এবং খুনিকে এভাবে ঘোল খাওয়াচ্ছেন? আপন মনে শ্রাগ করল ও। উইলিস মারা যাওয়ায় আচমকা হামলার সম্ভাবনা কমে গেছে। এবার হয়তো ডক্টর হপকিন্সকে খুঁজে বের করা ওর পক্ষে সহজ হবে।

যদি অবশ্য উইলিসের জায়গায় নতুন কেউ না আসে।

গোসল সেরে পোশাক পরে বেরিয়ে এলো রানা, দেখল এখনও বাথরুম থেকে বের হয়নি সামান্থা। ঘড়ি দেখল। লাঞ্চ আসতে এখনও পনেরো মিনিট দেরি আছে। ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে ফোন করল ও, নিজের পরিচয় দিয়ে ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারকে চাইল। ছয় মিনিট পর কয়েক হাত ঘুরে লাইনে এলেন ভদ্রলোক।

'হ্যালো, মিস্টার রানা।'

'হ্যালো,' কাজের কথায় এলো রানা। 'আপনাদের লাইনটা কি নিরাপদ?'

'সম্পূর্ণ,' দৃঢ় গলায় জানালেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার। 'নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন।'

'একটা ঝামেলা হয়ে গেছে,' বলল রানা, 'ঠিকানাটা লিখে নিন। ওখানে ক্লিনআপ ক্রু পাঠাতে হবে। পুলিশের জানা চলবে না ওখানে কী ঘটেছে।' আর কিছু ব্যাখ্যা করতে গেল না ও, যদিও বলা হয়েছে ফোনটা নিরাপদ, কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। এরপর হফম্যানের ফার্মের ঠিকানাটা জানাল ও।

'এই ঠিকানায় এখনই লোক পাঠাচ্ছি আমি,' বললেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার। বলার ভঙ্গিতে মনে হলো রানা তাঁর এখানে এসে ঝামেলা পাকানোয় অসন্তুষ্ট। 'আরেকটা কথা, মিস্টার রানা, আপনার জিনিসগুলো উদ্ধার করা গেছে, কখন আসবেন ওগুলো নিতে?'

'আজই আসব, বিকেলের দিকে,' বলল রানা। 'কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'না।'

বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল রানা। একটু পর দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলল ও। একটা ট্রলি ঠেলে ভেতরে ঢুকল বেলবয়। ওটার উপর লাঞ্চ সাজানো আছে।

টিপস দিয়ে বেলবয়কে বিদায় করল রানা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গলা চড়িয়ে সামান্থাকে ডাকল।

'আসছি!' বাথরুমের দরজা থেকে সাড়া দিল সামান্থা। দু'মিনিট পর রানার সুইটে ঢুকল সে। পরনে একটা রোব। ততোক্ষণে টেবিলে লাঞ্চ সাজিয়ে ফেলেছে রানা।

লাঞ্চের বাকি সময়টা নীরবে কাটল। লাঞ্চ শেষে সামান্থাকে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলল রানা।

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল সন্দিহান সামান্থা। 'তুমি কী করবে?'

'ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে যাব,' জানাল রানা। 'ওখানে কিছু কাজ আছে আমার। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরব।'

রানা আবার ওকে একা ফেলে বাইরে যাচ্ছে শুনে চেহারায় আপত্তির ছাপ ফুটে উঠল সামান্থার, তবে কিছু বলল না সে।

এবার এম্ব্যাসিতে গিয়ে আধমিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে, একজন আন্ডার সেক্রেটারি ওকে পৌঁছে দিল ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারের অফিসে।

হাতের ইশারায় রানাকে বসতে বললেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার, টেবিলের এক পাশের ড্রয়ার থেকে বের করলেন বাদামি রঙের একটা বড়সড় এনভেলাপ। ওটার ভিতরে ভারী কিছু আছে। এনভেলাপটা রানার সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

ওটার ভেতর থেকে রানার ওয়ালথার পিপিকে, শোল্ডার হোলস্টার আর স্ট্র্যাপ সহ স্টিলেটোটা বের হলো। ওয়ালথারের হ্যামার, ম্যাগাযিন আর চেম্বার পরীক্ষা করে দেখল রানা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না। না, মাতবরি ফলায়নি কেউ ওটার উপর। কোট খুলে হোলস্টার পরে ওয়ালথারটা ওটার ভিতর রেখে

দিল রানা। স্টিলেটো ঠাঁই পেল বাহুর পাশে। আবার কোট পরে নিল ও।

রানার দিকে চেয়ে আছেন ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডার, দৃষ্টিতে খানিকটা বিরক্তি। রানার ক্ষণিকের ব্যস্ততা শেষ হবার পর বললেন, 'আপনি যোগাযোগ করার পরেই লোক পাঠিয়ে ফার্মহাউসটা পরিষ্কার করিয়েছি আমরা। তবে পুলিশকে কিছু একটা বানিয়ে বলতে হবে। একজন ফার্মার কোনও চিহ্ন না রেখে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না তা হয় না।'

'যা ভাল বোঝেন করবেন,' বলল রানা। 'আমি তখন এদেশে থাকছি না, কাজেই অপ্রীতিকর কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না আমাকে।'

কথাগুলো শুনে চেহারাটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ ভদ্রলোকের। আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'আমরা যদি আর কিছু করতে পারি তা হলে জানাবেন।'

'অবশ্যই।' বিদায় না জানিয়েই দৃঢ় পায়ে অফিস থেকে বের হয়ে এলো রানা।

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে কানেকটিং দরজাটা লক করে দিতে গিয়ে চমকে গেল রানা। খুলে গেছে দরজা, খুদে পিস্তলটা হাতে সামান্থাকে দেখতে পেল ও। খানিকটা নিচু করে ধরা পিস্তলটা সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা।

'আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল তুমি এসেছ,' স্বাভাবিক স্বরে বলল সামান্থা। 'যা ভেবেছিলাম তার আগেই চলে এসেছ তুমি।'

'কাজেই আমাকে গুলি করতে হবে?' রানা হাসছে না।

'কী?' খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সামান্থা, তারপর নিজের হাতের দিকে তাকাল। 'ও, এটা? জঘন্য জিনিসটা রিলোড করতে চেষ্টা করছিলাম আমি, তখনই তোমার ঢোকার আওয়াজ পেলাম।' অস্ত্রটা নামিয়ে নিল সামান্থা।

'নিজের পায়ে গুলি করার আগেই ওটা আমার হাতে দাও,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল রানা। 'রিলোড করে দিচ্ছি আমি।' সামান্থার হাত থেকে খুদে অস্ত্রটা নিয়ে ম্যাগাযিন খুলে দেখল ও, ম্যাগাযিন ভরাই আছে। কথাটা বলল ও।

'রিলোড থাকাই তো ভাল।' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে হাসল সামান্থা।

'আরও ভাল সেফটি ক্যাচ অন করা থাকলে।' রানা দেখিয়ে দিল কাজটা কীভাবে করতে হয়। এবার অস্ত্রটা সামান্থার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

ওটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল সামান্থা হাত-ব্যাগে রাখবে বলে। পকেট থেকে কোঁচকানো কাগজ চারটে বের করে ডেস্কে বসে গভীর মনোযোগে দেখতে শুরু করল রানা স্কেচগুলো। মোট চারটে স্কেচ। একটাতে একজন আরেকজনকে খুন করছে। একটা স্কেচ কীসের তা বোঝা গেল না। বাকি দুটো রোমের কলোসিয়ামের স্কেচ। কলোসিয়ামের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার।

ডক্টর হপকিন্স যেন ইচ্ছে করেই সূত্র রেখে যাচ্ছেন, যাতে পিছু নিতে পারে রানা। কিন্তু কেন?

কাগজগুলো ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেবার আগেই ফিরে এলো সামান্থা, পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে আলতো করে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। কলোসিয়ামের

স্কেচের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর, জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কোথায়, রানা, ইতালি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'একটা স্কেচ আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল, এখন ধরে নিতে পারি আরেকটা আমাদের ইতালিতে নিয়ে যাচ্ছে।' একটু থামল ও। 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারেই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। তবে সুইটযারল্যান্ডেও আর থাকছি না, আগে হোক আর পরে, ওই পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লোকটা আমাকে জেলে ভরার চেষ্টা করবে। রীতিমতো উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে হফম্যানের লাশটা পেলেই।'

'তা হলে আমরা ইতালিতে যাচ্ছি,' বলল সামান্থা। 'তুমি যা ভাল মনে করো। তুমিই তো বস্।'

মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলল রানা। 'যাও, তা হলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

অভিমান ভরে ঠোঁট ওল্টাল সামান্থা। 'আমাকে একটু সাহায্য করবে না?'

'চলো।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে সামান্থার সুটকেস গোছানো হয়ে গেল। কাজটা শেষ করে ধপ করে বিছানার কিনারায় বসল সামান্থা। 'গত কয়েকদিনের ধকলের কারণেই বোধহয়, খুব ক্লান্তি লাগছে।'

'বিশ্রাম নাও আরও, সন্ধের প্লেন ধরব আমরা,' বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল রানা। কানেকটিং দরজাটা খুলে বিস্মিত হতে হলো ওকে।

স্যুইটে ঢোকার দরজার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে আছেন পুলিশ সুপার কার্ল গুস্তাভ। রানাকে দেখে বললেন, 'আহ্ মিস্টার রানা। আসুন, আসুন, হাজার হোক এটা তো আপনারই ঘর!' তাঁর দু'পাশে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে।

'ঠিকই বলেছেন, ঘরটা আমারই।' গলার ভেতরটা শুকনো ঠেকল রানার। দুই স্যুইটের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কার্ল গুস্তাভের মুখোমুখি দাঁড়াল ও। 'কী ব্যাপারে আপনার এই সদয় আগমন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট?'

'খুনের ব্যাপারে,' রানার চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গুস্তাভ। 'একটা নয়, দুটো খুনের ব্যাপারে আসতে হলো। শুনলে অবাক হবেন, আপনি এখানে আসার আগে সারা বছরেও দুটো খুন হয়নি এ শহরে। কাজেই আমি একটু সন্দিহান হয়ে উঠেছি বলতে পারেন। কাকতালীয় ব্যাপার-স্যাপারে আমার আবার একেবারেই বিশ্বাস নেই।'

'আমিও ওসব বিশ্বাস করি না,' শান্ত গলায় বলল রানা। বুঝতে পারছে পরিবেশটা কেমন যেন আড়ষ্ট, পরিস্থিতি যে-কোনও সময়ে ওর বিরুদ্ধে চলে যাবে। তার আগেই করতে হবে কিছু একটা। চেস্ট অভ ড্রয়ার্সের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একে একে জিনিস বের করে রাখতে শুরু করল ও। মানিব্যাগ, চাবি, খুচরো পয়সা–তারপর ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় এমন একটা ভঙ্গিতে পকেট থেকে বের করে উপরের ড্রয়ারে রেখে দিল সিগারের টিউবগুলো।

পুরোটা সময় মৃদু আপত্তির সুরে সুইস পুলিশের কর্মতৎপরতা নিয়ে কথা বলল। মনে মনে আশা করল সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোনও কিছু সন্দেহ করবে না।

রানা ঘুরে দাঁড়াতেই কার্ল গুস্তাভ বললেন, 'মিস্টার রানা, আমরা কিন্তু এখানে কাকতালীয় ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে আসিনি।'

'অবশ্যই না।' চেস্ট অভ ড্রয়ার্সে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। 'বলুন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কী জন্যে এসেছেন?'

'আপনাকে গ্রেফতার করতে।'

নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'আমাকে... গ্রেফতার··· জানতে পারি কি কারণে?'

'ও নিয়ে ভাববেন না।' দাঁত বের করে মেকি হাসি হাসলেন গুস্তাভ। 'একটা কিছু অভিযোগ আমি ভেবে বের করে নেব পরে।'

হাসল রানাও। রানাকে হাসতে দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'হাসছেন যে?'

'আপনার কথা শুনে,' বলল রানা। 'আপনার কথায় আমার দেখা একটা আমেরিকান সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল।'

'ব্যাপারটা এত হালকা ভাবে নিচ্ছেন দেখে খুশি হতে পারলাম না, মিস্টার রানা,' বললেন গুস্তাভ। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক আমাদের দেশে এসে খুন-খারাবি করে বেড়াবে আর আমরা সেটা হতে দেব, তা হয় না।'

'আপনার ধারণা আমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক?' বিস্ময় মেশানো আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল ভাবছেন আপনি।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন গুস্তাভ। 'তা-ই? তা হলে নিজেকে আপনি কি ছুটি কাটাতে আসা সাধারণ ট্যুরিস্ট বলবেন?'

'নিশ্চয়ই! আমি আসলে তা-ই।'

বাঁকা হাসলেন গুস্তাভ। 'আর ট্যুরিস্টদের পিস্তল এবং স্টিলেটো উদ্ধার করতে ইদানীং অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ দূতাবাস, তা-ই না?'

ঝড়ের গতিতে কাজ শুরু করল রানার মাথা। লোকটার কথার জবাবে উপযুক্ত কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা ওর মাথায় এলো না। অথচ কিছু একটা... নইলে আবার ধরে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। এবং ছাড়া পাওয়াটা এবার সহজ হবে না।

'আমার মনে হয় স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে এলেই ভাল করবেন,' রানাকে নীরব দেখে বললেন গুস্তাভ।

রাগের ছাপ পড়ল রানার চেহারায়। আশা করল অভিনয়টা নিখুঁত হচ্ছে। দ্রুত পায়ে কার্ল গুস্তাভকে পাশ কাটিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল ও, দ্রুত ডায়াল করছে। 'আপনি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন না। ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে ফোন করছি আমি।'

ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে উপুড় করে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন গুস্তাভ। 'পরে করবেন ফোন।'

'আপনি আমাকে ফোন করতে বাধা দিতে পারেন না!' অসহায় একটা ভঙ্গি

করল রানা।

'এটা ব্রিটেন নয়,' শান্ত গলায় বললেন সুপার। 'আমি কী করতে পারি আর কী পারি না, দয়া করে সেটা আমাকে শেখাতে আসবেন না। আশা করি স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যাবেন, নইলে আমরা বাধ্য হবো...'

ইউনিফর্ম পরা পুলিশ দু'জন এগিয়ে আসছে দেখে এক হাত তুলল রানা। 'দাঁড়ান দাঁড়ান, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমাকে ব্রিটিশ সিক্রেট...'

একজন পুলিশ রানার হাতটা ঝাপ্টা মেরে সরিয়ে দিল। গুস্তাভ বললেন, 'আপনার পিস্তলটা দিন, প্লিজ।'

'নিন,' কোটের ভেতর হাত ভরে ওয়ালথারটা বের করে বাড়িয়ে দিল রানা। একজন পুলিশ ওটা নিয়ে নেওয়ায় একটু ইতস্তত করে বলল, 'যাবার আগে একটু বাথরুমে যেতে পারি?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল সুপারের চেহারায়, তবে মাথা দোলালেন তিনি। 'যান।'

'নার্ভাস হয়ে পড়লে আমাকে আবার একটু টয়লেট করতেই হয়।' বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। বাহুর খাপ সহ স্টিলেটো খুলে ফেলল, বের করল গ্যাস বোমাটা। মেডিসিন চেস্টের ভেতরে সরু একটা খুপরিতে রেখে দিল ও-দুটো। জায়গাটা গোসলের সময় আবিষ্কার করেছে ও। সাধারণ সার্চে ওগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। টয়লেটে ফ্লাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে মিনিট দুয়েক পর বেরিয়ে এলো রানা বাথরুম থেকে।

'চলুন এবার।'

'আপনার স্টিলেটো কিন্তু দেননি,' ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখছেন কার্ল গুস্তাভ।

'ওটা এম্ব্যাসি থেকে আনতে ভুলে গেছি,' নার্ভাস হাসল রানা।

'আশা করি কিছু মনে করবেন না,' ইউনিফর্ম পরা পুলিশ দু'জনকে ইশারা করলেন গুস্তাভ। দক্ষ হাতে দ্রুত সার্চ করল তারা রানাকে, তারপর একটু পিছিয়ে মাথা নাড়ল।

'আপনি বোধহয় ধারণা করেছিলেন টয়লেটে আরেকটা পিস্তল লুকিয়ে রেখেছি আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মনে করেছিলেন ওটা আনতেই গেছি।'

'চিন্তাটা মাথায় আসেনি তা বলব না।' চেয়ার ছাড়লেন গুস্তাভ। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আমেরিকান মারদাঙ্গা সিনেমা দেখা বন্ধ করা উচিত আপনার।'

কার্ল গুস্তাভ হাসলেও সেটা দেখতে হলো ভেঙচির মতো। 'আমার কথা বাদ দিন। ধারণা করছি, যে-কোনও ধরনের সিনেমা দেখতে হলে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। আপনার জায়গায় আমি হলে অন্য কারও কথা না ভেবে নিজের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করতাম।'

উনিশ

এবার পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে রানাকে কোনও ঘরে আটকে রাখা হলো না, ওর একার জন্য বরাদ্দ করা হলো একটা সেল। আরেকবার সার্চ করা হয়েছে ওকে, খুলে নেয়া হয়েছে বেল্ট আর জুতোর ফিতে, তারপর ঢোকানো হয়েছে বেযমেন্টের এই চৌকো ছোট্ট সেলে। নিজেকে রানার খাঁচায় বন্দি পশু মনে হচ্ছে।

'আমার আসতে খানিক দেরি হবে, মিস্টার রানা,' চলে যাবার আগে বলেছেন গুস্তাভ। 'ততক্ষণ আরাম করুন।'

'আপনারা ভুল করছেন, সুপার,' আরেকবার বলেছে রানা।

'পরে দেখা যাবে সত্যি আমরা ভুল করছি কি না,' বলে চলে গেলেন গুস্তাভ।

তারপর অনেকক্ষণ হলো বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে রানা। তখন হোটেলে ওর ঘর থেকে কার্ল গুস্তাভের সামনে সামান্থার ঘরে ফোন করেছিল ও, এখন মনে মনে আশা করছে ফোনটা সামান্থা ধরেছিল, শুনেছে ওদের কথোপকথন। সেক্ষেত্রে হয়তো ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে যোগাযোগ করবে ও, তারা কিছু একটা ব্যবস্থা নেবে। দেরি হয়ে গেলে ইতালি থেকেও হয়তো সরে পড়বেন ডক্টর হপকিন্স–যদি অবশ্য আদৌ তিনি ওখানে গিয়ে থাকেন। তিনি ইতালিতে গেছেন কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটা সন্দেহ খচ্খচ্ করছে রানার মনের ভিতর। স্কেচগুলো কি আসলেই ডক্টরের নিজের আঁকা, না ওকে চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্যে? আরও গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করল রানা। একটার পর একটা ছেঁড়া সুতো জোড়া দিচ্ছে। ক্রমেই গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হয়ে উঠছে ওর চেহারা।

কতক্ষণ সময় গড়িয়েছে রানা বলতে পারবে না। ওর ঘড়িটাও নিয়ে নেওয়া হয়েছে অন্য সবকিছুর সঙ্গে। তবে ছ'সাত ঘণ্টা পর ফিরলেন কার্ল গুস্তাভ, সেলের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, চেহারায় স্পষ্ট অসন্তোষ।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোর্টে নেয়া হচ্ছে আমাকে?'

'অত কথায় আপনার দরকার কী!' প্রায় ধমকে উঠলেন কার্ল গুস্তাভ। 'আসতে বলেছি আসবেন।'

পিছু নিল রানা, যে-ঘরে প্রথমবার ওকে আটকে রাখা হয়েছিল সে-ঘরে ওকে নিয়ে এলেন গুস্তাভ। ব্রিটিশ ডেপুটি অ্যাম্ব্যাসাডারকে বসে থাকতে দেখল রানা ঘরে ঢুকে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে ওর বেল্ট, জুতোর ফিতে, ঘড়ি আর ওয়ালথারটা।

'এই যে আপনার লোক, মিস্টার স্ট্যানলি,' বললেন গুস্তাভ। 'আশা করি কী

কথা দিয়েছেন সেটা মনে রাখবেন আপনি।' আর কিছু না বলে, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কী অবস্থা আপনার?' জানতে চাইলেন অ্যাম্বাসাডারের ডেপুটি। 'ওরা মারধর করেনি তো আপনাকে?'

'না।' টেবিলের ওপর থেকে ফিতে দুটো নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী কথা দিয়েছেন আপনি কার্ল গুস্তাভকে?' ব্যস্ত হাতে জুতোর ফিতে লাগাচ্ছে ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডেপুটি অ্যাম্বাসাডার। 'চলুন আগে এখান থেকে বেরোনো যাক, তারপর বলব।'

ঘড়ি আর বেল্ট পরে নিল রানা, হোলস্টারে গুঁজল ওয়ালথারটা। 'চলুন।'

পুলিশ স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে ডেপুটি অ্যাম্বাসাডারের কালো রঙের প্রকাণ্ড রোলস রয়েস। পিছনের সিটে বসে আছে সামান্থা। গাড়িতে উঠে ওর পাশে বসল রানা। আরেক পাশ দিয়ে উঠলেন ডেপুটি অ্যাম্বাসাডার।

'তুমি ফোন করায় ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমি,' বলল সামান্থা। 'ভেবেছিলাম বিরাট বিপদে পড়ে গেছ। রিসিভার রেখে দিচ্ছিলাম, ঠিক করেছিলাম পিস্তলটা নিয়ে তোমার ঘরে যাব। তারপর তোমার সঙ্গে পুলিশের কথাবার্তা শুনলাম। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি দরজা সামান্য ফাঁক করে। এম্ব্যাসিতে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসেনি।'

'একদম ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করেছ,' বলল রানা। ডেপুটি অ্যাম্বাসাডারের দিকে ঘাড় ফেরাল ও। 'মিস্টার স্ট্যানলি, পুলিশ সুপারকে কী কথা দিয়েছেন আপনি?'

'কথা দিতে হয়েছে ফ্রেডরিক হেইঞ্জ আর রালফ হফম্যানের খুনির খোঁজ দেব,' বললেন ডেপুটি অ্যাম্বাসাডার। 'সেই সঙ্গে এ-কথাও দিতে হয়েছে যে দেরি না করে সুইটযারল্যান্ড ছেড়ে চলে যাবেন আপনি।'

'আমিও চলে যাবার কথাই ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'এখানে আমার আর কোনও কাজ নেই।'

'ভেরি গুড।' স্বস্তির ছাপ পড়ল মিস্টার স্ট্যানলির চেহারায়।

পথে আর কোনও কথা হলো না। সামান্থা আর রানাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ডেপুটি অ্যাম্বাসাডার।

আধঘণ্টা পর হোটেল জেনোয়া থেকে চেকআউট করল ওরা।

জেনেভা থেকে রোমগামী প্লেনে উঠে রানা সিদ্ধান্ত নিল কীভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কিছুই করবে না আসলে ও। এটাই সিদ্ধান্ত। কেউ ওকে খেলাচ্ছে। সেই কেউটা কে? স্বয়ং মার্ভিন লংফেলো? অসম্ভব নয়।

কী তাঁর উদ্দেশ্য সেটা ও জানে না। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু নয়। ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে ডক্টর হপকিন্সকে খোঁজার কোনও রকম চেষ্টাই করবে না ও। ওর ধারণা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হলে এমন কিছু একটা ঘটবে যেটা ওকে ডক্টরের খোঁজ জানতে পথ দেখাবে। মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আশা

করা যায় তা হলেই অনেক ঝাপসা ভাব কেটে যাবে, সমাধান পাওয়া যাবে জটিল কিছু রহস্যের।

সামান্থার দিকে তাকাল রানা। হালকা নাস্তা শেষে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক সিটে আধশোয়া হয়ে আছে সামান্থা।

এক সময় এয়ারহোস্টেসের গলা ভেসে এলো স্পিকারে: 'প্লিজ ফাসেন ইওর সিট বেল্ট। উই আর ডিসেন্ডিং।'

সামান্থা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর সিটবেল্ট বেঁধে দিল রানা। নিজেরটাও বেঁধে নিল।

নড়াচড়ায় ঘুম ভেঙে গেল সামান্থার, আড়মোড়া ভেঙে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। অদ্ভুত মিষ্টি লাগল ওকে দেখতে। আফসোস হলো রানার, মেয়েটা যদি শুধু...

'ভেবেচিন্তে ঠিক করেছ রোমে গিয়ে কী করব আমরা?' হাই তুলে জানতে চাইল সামান্থা।

'একটা প্ল্যান করেছি,' বলল রানা। মনে মনে যোগ করল, প্ল্যানটা হলো, কিছুই না করে মার্ভিন লংফেলোর মুখ খোলানো!

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উঠল ওরা। আলাদা স্যুইট নিয়েছে রানা এবারও, তবে আগের মতোই কানেকটিং স্যুইট। হোটেলের ডাইনিং রুমেই রাতের খাওয়া সারল ওরা, তারপর সামান্থা জানাল খুব ক্লান্তি লাগছে ওর, ঘুমিয়ে পড়বে।

ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল রানা, মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর ফোন করল মার্ভিন লংফেলোর বাড়িতে, স্টাডির নম্বরে। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ধরলেন লংফেলো।

পরিচিত ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো? দিস ইয মার্ভিন লংফেলো'স রেসিডেন্স। লংফেলো স্পিকিং।'

'আমি রানা, মিস্টার লংফেলো।'

'রানা?' শ্বাস আটকে ফেললেন লংফেলো। 'গুড গড! জেনেভায় কী ঘটেছে শুনেছি। উইলিস যে... সত্যি ভাবতে পারছি না। তুমি এখন কোথায়, রানা?'

'রোমে।'

'রোমে?' বিস্মিত শোনাল লংফেলোর কণ্ঠ। 'কেন, রোমে কেন?'

'কারণটা নিশ্চয়ই জানেন আপনি,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা।

ও-প্রান্তে খানিক নীরবতা। 'কী বলছ, রানা?'

অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল রানা। 'সামান্থা লেইটারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেখেছেন, সার?'

'একবার তো চেক করা হয়েছেই। নতুন করে আরেকবার করা দরকার বলে ভাবছ তুমি?'

'তার ফটোটা এখনও আমি পাইনি,' বলল রানা।

'ওটা যোগাড় করতে একটু দেরি হচ্ছে... রানা, তুমি কি এখনও সন্দেহ করছ তাকে?'

'না, নির্দিষ্ট কাউকে সন্দেহ করছি না আমি,' বলল রানা। 'তবে আপনাদের অফিসে এমন অনেকেই আছে যারা আসলে বিএসএস-এর কাজ না করে নিজেদের কাজ করছে।'

'আর কারও নাম জেনেছ?' ব্যগ্র শোনাল মার্ভিন লংফেলোর কণ্ঠ। 'উইলিস মুখ খুলেছিল?

'না, তার আগেই মারা যায় ও,' বলল রানা। 'এখনও আর কারও নাম জানিনি, তবে জানব।' একটু থেমে বলল, 'মিস্টার লংফেলো, আপনার অফিসের ব্যক্তিগত লাইনেও ছারপোকা আছে। কম্পিউটারেও। কাজটা কার আপনি কি ধারণা করতে পারেন?'

'আমার লাইনে...' চুপ করে গেলেন লংফেলো। 'তুমি কি শিওর?'

'মোর দ্যান শিওর।'

'তা হলে আপাতত গোপন কোনও কাজে ওগুলো ব্যবহার করা যাবে না,' বললেন লংফেলো। 'তবে কথাটা জানিয়ে একটা কাজের কাজ করেছ। লিসেনিং ডিভাইসের রিসিভার ডিটেক্ট করার একটা আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তোমাদের ডক্টর শামশের আলী। ওটা ব্যবহার করে আমরা হয়তো জানতে পারব কে কোথা থেকে শব্দতরঙ্গ রিসিভ করেছে।'

'শীঘ্রি জানুন,' তাগাদার সুরে বলল রানা। 'নইলে ডক্টর হপকিন্সকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছেন সেখান থেকে হয়তো তুলে নিয়ে যাবে ওরা তাঁকে।'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন মার্ভিন লংফেলো। 'কী বলছ রানা!'

'আপনি যে তথ্যগুলো আমাকে দিতে চাননি সেগুলোর বেশির ভাগই বোধহয় জেনে ফেলছি আমি,' শান্ত শোনাল রানার গলা। 'আমি ভেবে দেখেছি, এ-পর্যন্ত যাদেরই ঠিকানা আপনি দিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আপনার বিশ্বস্ত এজেন্ট। প্রথমে যদিও বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে কয়েকটা ব্যাপার আমার মনে সন্দেহ জাগায়।'

'কী সেই ব্যাপারগুলো?' রানা চুপ হয়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করলেন লংফেলো।

'মিকি উইলিস ফ্রেডরিক হেইঞ্জকে খুন করার পর ওখানে যাই আমি, একটা ল্যুগার পাই হেইঞ্জের ঘরে। রালফ হফম্যানের কাছেও একটা ল্যুগার ছিল। মিকি উইলিসের কাছেও। তিনটেই নাইন এমএম ল্যুগার। বিএসএস-এর ফিল্ড এজেন্টদের স্ট্যান্ডার্ড ইশ্যু। অ্যান্থনি লেমঁর কাছেও ওই জিনিস দেখেছি একটা।

'ডক্টর হপকিন্স যেখানেই যাচ্ছেন বলে ধারণা পেয়েছি সেখানেই পেয়েছি স্কেচ। তাঁর এত কীসের ঠেকা যে কোথায় যাচ্ছেন তা এভাবে জানাতে যাবেন? খুনি একবারও তাঁর নাগাল পেল না, অথচ আমার আগেই পৌঁছে গেছে সে সবখানে। কীভাবে দক্ষ একজন স্পাইকে বারবার ফাঁকি দিয়েছেন ডক্টর

হপকিন্সের মতো একজন বিজ্ঞানী, যাঁর এসপিয়োনাজের কিছুই জানা নেই? বুঝে নিলাম, আসলে ডক্টর হপকিন্স ওসব জায়গাতে ছিলেনই না। মিস্টার লংফেলো, ডক্টর হপকিন্স ফ্রান্সে বা সুইটযারল্যান্ডে আসলে যাননি, তা-ই না? তা হলে কোথায় তিনি?'

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন লংফেলো। 'আমার বাড়ির সেলারে। বিএসএস-এর কেউ জানে না। গ্লাসগো থেকে আমি নিজে তাঁকে পিক করি, গাড়িতে করে নিয়ে আসি আমার এখানে।'

'সব কথা আমাকে আগে বলে রাখলেই বোধহয় ভাল করতেন, তাই না?'

ওদিকে নীরবতা। তারপর মার্ভিন লংফেলো নরম সুরে বললেন, 'কারণ, রানা, বিএসএস-এর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, বিশেষ করে যখন জানি আমারই সংগঠনের ভেতর বিশ্বাসঘাতক আছে। তাই তোমার কাছ থেকে যখন সাহায্যের প্রস্তাব পেলাম, বুঝলাম সিরিয়াসলি ডক্টরকে খুঁজবে তুমি। আর তুমি খুঁজবে বলেই বিরুদ্ধপক্ষের লোকও তোমার পিছু নেবে। ওরা ডক্টরকে হাতে পাবার জন্যে একশোটা লাশ ফেলতেও দ্বিধা করবে না। আমাদের চাইনিজ ডাবল এজেন্ট জোনাথন হেইন্স জানিয়েছিল ডক্টর হপকিন্সকে পাবার বদলে গোপন একটা সংগঠনকে দশ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অফার করেছে অথরিটি। অনেক চেষ্টা করেও সংগঠনটা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি হেইন্স। ডক্টর হপকিন্সকে নিউক্লিয়ার ফিযিক্সের জাদুকরও বলতে পারো। সে যা-ই হোক, কাজটা তোমাকে দেয়ার অনেক পরে আমি জানতে পারি এমআই ফাইভেও বিশ্বাসঘাতকদের লোক আছে। টিউবটার কথা জানে তারা। কীভাবে তা সম্ভব, যদি না বিএসএস-এর কোনও বিশ্বাসঘাতক তাদের জানিয়ে থাকে? তখনই আমার সন্দেহ হয় ছারপোকা ছড়ানো হয়েছে আমার অফিসে। এক্সপার্টরা কয়েকটা ছারপোকা খুঁজেও পায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারপরও গোপন তথ্য গোপন থাকল না। তোমার কথায় একটু আগে হঠাৎ একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেছে।'

'কী সেটা?'

'আমাদের এক বিজ্ঞানী, ডক্টর স্টিভেন্স, কিছুদিন আগে নতুন ধরনের লিসেনিং ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন। জিনিসটা ন্যানো টেকনোলজির ফসল। পিঁপড়ের দশ ভাগের এক ভাগ হবে আকারে। ওটা এক্সপার্টরা খুঁজে না পাওয়ায় খুব একটা অবাক হচ্ছি না আমি।'

'কিন্তু ডক্টর শামশের আলীর যন্ত্রে ওটার অস্তিত্ব ধরা পড়বে?'

'পড়বে। শুধু তা-ই নয়, রিসিভিং ডিভাইসটাও লোকেট করবে ওটা, যদি দশ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে জিনিসটা থেকে থাকে।

'আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজনের ঠিকানা দিই তোমাকে, এদিকে ওদের সতর্ক করে দিই, যেন ওরা তৈরি থাকে, বিএসএস-এর কোনও এজেন্ট আমার অথোরাইযেশন ছাড়া ওদের সঙ্গে দেখা করলে যাতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে খুন করে। শুনেছি লেমঁর কোনও ক্ষতি হয়নি

ওদের আগেই তুমি পৌঁছে গিয়েছিলে বলে। সুইটযারল্যান্ডে হেইঞ্জের ওখানে যায় উইলিস। হেইঞ্জ আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। আর হফম্যান নিজে খুন হয়ে গেলেও উইলিসকে শেষ পর্যন্ত মারতে পেরেছে। তবে উইলিস লন্ডনের সেই কুরিয়ার কিলার ছিল না, রানা। গত একমাস ধরে আমাদের সুইস স্টেশনের চিফ হিসেবে কাজ করছিল ও। থরো চেক করে দেখেছি, একবারও সুইটযারল্যান্ড ছাড়েনি সে এরমধ্যে। আমি ধারণা করেছিলাম যেহেতু কুরিয়ার এজেন্টরা শুধু ব্রিটেনেই খুন হয়েছে, কাজেই শুধুমাত্র ব্রিটেনে অপারেট করছে বিশ্বাসঘাতকরা। যে-কারণে লেমঁ, হেইঞ্জ আর হফম্যানকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি। উইলিস মারা যাওয়ায় অবশ্য বুঝেছি আমার সে ধারণা ভুল ছিল।'

'নিজের এজেন্টদের সতর্ক করেছেন আপনি,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাকে রেখেছিলেন অন্ধকারে।'

'তা রেখেছিলাম, স্বীকার করি, কিন্তু ভেবে দেখো সেই প্রথম থেকে কীভাবে তোমাকে প্রটেকশন দেয়া হয়েছে,' বললেন বিএসএস চিফ। 'তোমাকে মারার জুতসই কোনও সুযোগই পায়নি শত্রুরা, তার আগেই আমার বিশ্বস্ত লোকের হাতে নিজেরাই খুন হয়ে গেছে।' একটু চুপ করে থাকলেন লংফেলো, তারপর আবার বললেন, 'তা হলে এবার নিশ্চয়ই লন্ডনে ফিরছ তুমি? ফিরে এসো, রানা, আরও এমন কিছু তথ্য আছে যেগুলো তুমি জানো না, জানা দরকার।'

খুট করে কেটে গেল কানেকশন।

বিশ

হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়াল রানা আর সামান্থা।

'এবার?' রানার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল সামান্থা। 'কী করবে ভাবছ?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব,' বলল রানা। 'তুমি কি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবে?'

'ইচ্ছে করছে না,' বলল সামান্থা। 'ওখানে একা খুব খারাপ লাগবে আমার।'

'তা হলে এক কাজ করা যায়,' হাতের ইশারায় সামান্থাকে এগোতে বলল রানা, চট করে ওর মনে পড়ে গেছে আজ রোববার, অফিস বন্ধ। শাহানা বাড়িতেই থাকবে। 'তুমি রানা এজেন্সির অফিস-সেক্রেটারির বাড়িতে থাকতে পারো আপাতত। মনে হয় ওর সঙ্গ তোমার ভাল লাগবে।'

'অপরিচিত একজনের সঙ্গে...'

'শাহানা আক্তার খুব মিশুক, সহজেই আপন করে নেবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে তা হলে,' একটু দ্বিধা করে বলল সামান্থা।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কেনসিংটন স্ট্রিটের একটা ঠিকানা দিল রানা। এক ঘণ্টা পর পৌঁছে গেল ওরা পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে। লিফটে করে উঠে এলো দু'জন পাঁচতলায়। লম্বা করিডরের দু'পাশে ছয়টা ফ্ল্যাট আছে। ডানদিকের তৃতীয় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপল রানা।

দরজাটা খুলে গেল আধ মিনিট পর। সরল দুটো চোখ শ্রদ্ধা আর অগাধ ভক্তি নিয়ে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। ছোটখাটো মানুষটার চেহারায় আন্তরিক খুশির ছাপ।

'সার! আর ক'দিনই বা বাঁচব, ভাগ্যিস দেকাটা হয়ে গেল। মিরতুর আগে আর দুক্খো থাকল না।' বাঁ হাতটা লুকিয়ে ফেলেছে গিল্টি মিয়া দেহের পেছনে। সরে দাঁড়াল সে। 'আসুন, সার, ডেঁড়িয়ে কেন?'

'কী খবর, গিল্টি মিয়া?' সামান্থাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। 'কী লুকালে?'

লজ্জার ছাপ পড়ল গিল্টি মিয়ার চেহারায়। 'ও কিচু নয়, সার।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা, যদিও আন্দাজ করতে পারছে গিল্টি মিয়ার হাতে কী থাকতে পারে। 'হাতটা সামনে আনো দেখি।'

ইতস্তত করে বাঁ হাত সামনে আনল গিল্টি মিয়া। ওর হাতে ডক্টর দুর্গাদাস আচার্যের 'হাজারও অসুখ ও তার উপসর্গ' নামের একটা মোটাসোটা বোর্ড বাঁধাই বই।

কিচেনে ছিল, কথার আওয়াজ পেয়ে চলে এসেছে শাহানা আক্তার, রানাকে দেখে সালাম দিল। সালামের জবাব দিয়ে ওর সঙ্গে সামান্থার পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

রানার দিকে তাকাল শাহানা। 'মাসুদ ভাই, আমার মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে গিল্টি মিয়া। গত এক ঘণ্টা ধরে ওর কী কী রোগ হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনেছি। এবার উপসর্গগুলো আরেকবার পড়ে শোনাবে বলছিল! মরার আগে কী কী রোগে কীভাবে মরেছে তা কাউকে না বলে গেলে নাকি মরেও শান্তি পাবে না ও।'

সামান্থাকে দেখাল রানা। 'ওকে নিয়ে বসাও, আমি আসছি।'

সামান্থাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে ড্রইং রুমে বসাল শাহানা। দরজা বন্ধ করে দিল লজ্জিত গিল্টি মিয়া। তাকে নিয়ে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াল রানা। 'এবার কী অসুখে পড়লে, গিল্টি মিয়া?'

'আর সব রোগ তো আচেই, সার, সেই সাতে বুক ধড়ফড়ানি। শিরদেঁড়াটা ব্যাঁকা হয়ে যাচ্চে কেরমে। দুক্খের কতা কী বলব, চাকরানিদের হাঁটু ফোলা রোগটাও আচে। এটা আজই ধরল, সার।'

'সর্বনাশ!' হাসি চেপে বলল রানা। 'চিকিৎসা চলছে তো?'

'ডাক্তারগুনো আমার কুনো কতা শুনতে চায় না, সার, হেঁকিয়ে দেয় একটা-দুটো কতা শুনেই। ভিজিট নেবার বেলায় আচে, কিন্তু কাজের লয় একটাও।'

‘খুব খারাপ!’ অত্যন্ত গম্ভীর করে তুলল রানা চেহারাটা। ‘ভাবছি তোমার চিকিৎসাটা হার্বারিয়ামে হলেই ভাল হয়।’

দপ করে আশার আলো জ্বলে উঠল গিল্টি মিয়ার দু’চোখে। ‘হাবড়ানিয়াম, সার? কী ওটা? ওকেনে বুড়ো হাবড়াদের চিকিচ্ছে হয় বুঝি?’

‘না, ওটাকে তুমি সুখের স্বর্গও বলতে পারো। অসুখের কোনও চিহ্নই থাকবে না, ওখানে কদিন থাকলে বিলকুল সেরে উঠবে। এক দৌড়ে দশতলা দালানে উঠতে-নামতে পারবে।’

‘তা হালে, একবার ওকেনে যাই না কেন, সার? যদি আরও দুটো দিন বেশি বেঁচে থেকে দেশ ও দশের সেবা করতে পারি...’

রানা মনে মনে বলল, ঠিক আছে, দাঁড়াও, এবার তুমি এমন নাস্তানাবুদ হবে যে অসুস্থ হওয়ার শখ চিরতরে দূর হয়ে যাবে। সকালে এক গ্লাস পানি আর দু’ ফোঁটা লেবুর রস তোমার চাকরানিদের হাঁটু ফোলা রোগ দূর করতে মহৌষধের কাজ দেবে!

‘মাসুদ ভাই, নাস্তা করেছেন আপনারা?’ ড্রইংরুমে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল শাহানা।

‘হ্যাঁ।’ বসল না রানা। মুখে ক্লিষ্ট হাসি নিয়ে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গিল্টি মিয়া, শত শত কল্পিত অসুখে ভুগে চেহারা একেবারে কাহিল। ‘শাহানা, গিল্টি মিয়া, তোমরা সামান্থাকে সঙ্গ দাও, আমি একটু বেরুচ্ছি।’

‘ফিরতে দেরি হবে, মাসুদ ভাই?’ জানতে চাইল শাহানা। ‘দুপুরের আগে ফিরলে আপনার পছন্দের খাবার রাঁধতে পারি।’

‘এখনই বলতে পারছি না,’ বলল রানা। ‘তবে আশা করছি দুপুরের আগেই ফিরব।’

গিল্টি মিয়া জিজ্ঞেস করল, ‘সার, আমি আপনার সাতে আসি?’

‘না, দরকার নেই,’ ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানা। ‘তোমার শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না। দরজাটা লাগিয়ে দাও দেখি।’

দরজার কাছে এসে গিল্টি মিয়া জিজ্ঞেস করল, ‘সার, সেই হাবড়ানিয়ামটা কি কাচেই কোতাউ?’

‘না। বার্মায়। খুব শীঘ্রিই ওখানে পাঠানো হবে তোমাকে।’

ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো রানা টেমস নদীর তীরে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস-এর অফিসে। মার্ভিন লংফেলোর কামরায় ঢুকতে দু’মিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। আগেই প্রাইভেট সেক্রেটারিকে জানিয়ে রেখেছেন লংফেলো।

রানা ঢুকতেই বললেন, ‘বসো, রানা।’

বসল না রানা, চলে এলো মার্ভিন লংফেলোর পাশে, এবার পকেট থেকে অ্যালুমিনিয়াম টিউবটা বের করে নির্দ্বিধায় ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। ‘ব্রিটেনের জন্যে ভাইটাল ইনফর্মেশনটা নিরাপদ জায়গাতেই রাখলাম, সার। কী বলেন?’

হেসে উঠলেন মার্ভিন লংফেলো। কাত হয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে

টিউবটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন।

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। টিউবটা হাতে নিলেন লংফেলো। 'এটা একজনকে উপহার দেব। এটার ভেতরে দুনিয়ার সেরা কিউবান সিগার আছে। তুমি কি আন্দাজ করতে পারছ, কাকে দেব?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খানকে,' বিনা দ্বিধায় বলল রানা।

'ঠিক ধরেছ,' মৃদু হাসলেন লংফেলো। 'উপহারটা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব, অনুমতি ছাড়া তাঁর প্রিয় এজেন্টকে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের কাজে লাগানোর জন্যে।' কী যেন আরও বলতে যাচ্ছিলেন, রানা প্রশ্ন করায় বাধা পেলেন।

'ডক্টর শামশের আলীর ডিটেক্টর কাজ করেছে?'

সামনে ঝুঁকে বসলেন লংফেলো। 'হ্যাঁ। সমস্ত কথা, সমস্ত তথ্য রিসিভ করছিল এমআই ফাইভের ডেপুটি চিফ বিল টাকার। কাল রাতে ওদের অফিস বন্ধ হবার পর সার্চ করা হয়েছিল তার অফিসটা, ডিটেক্টর ওখানেই রিসিভিং ডিভাইস লোকেট করে। ডক্টর শামশের আলীর যন্ত্রটা দিয়ে রিসিভারটা অফিসের কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে দু'মিনিটও লাগেনি।'

'গ্রেফতার করা হয়েছে বিল টাকারকে?'

'প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি, তবে প্রক্রিয়াটা চলছে। আজ বা কালই গ্রেফতার হয়ে যাবে। কাজটা করতে হবে অত্যন্ত গোপনে, নইলে তার সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা পালাবে।'

'মুখ খুলবে সে?'

'অবশ্যই! ওর ওপর লেটেস্ট ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করব আমরা। গড়গড় করে সব কথা উগরাবে লোকটা। ধরে নাও বিশ্বাসঘাতকরা সবাই ধরা পড়তে যাচ্ছে।'

'আমাকে সব কথা খুলে না বলার কারণটা কিন্তু এখনও পরিষ্কার হয়নি, মিস্টার লংফেলো,' হালকা সুরে বলল রানা।

'কারণ হলো, তখন ভেবেছিলাম, সব কথা জানলে তুমি খানিকটা অসতর্ক হয়ে পড়বে। এমন কোনও আচরণ করে বসতে পারো যা থেকে শত্রুপক্ষ বুঝে যাবে আসলে ভাঁওতা দেয়া হচ্ছে তাদেরকে।'

'এবার শুধু তথ্য সংগ্রহই নয়, সেই সঙ্গে ডক্টর অলিভার হপকিন্সকেও হাতে পেতে চেয়েছিল ওরা, তা-ই না?'

'আমার অন্তত তা-ই ধারণা।'

'সামান্থা লেইটার। এ-সবে ওর ভূমিকা কী?'

'যা বলেছে ও তা-ই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছে মেয়েটা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্ভিন লংফেলোর। 'কেন? ওর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেছি আমরা, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ওর ফ্ল্যাট সার্চ করা হয়েছে। আগে তোলা ছবি আর ইদানীংকালের ছবি মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ও আসলেই সামান্থা লেইটার।' ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা বাদামি এনভেলাপ বের করলেন

লংফেলো। 'একটু দেরিতে হলেও ছবিগুলো পেয়েছি, দেখতে পারো ইচ্ছে করলে।'

এনভেলাপটা নিয়ে ছবিগুলো বের করল রানা। একটার পর একটা দেখছে। বেশিরভাগই ছোটবেলার ছবি। তবে একটা ছবি তোলা হয়েছে সাগর-সৈকতে, বিকিনি পরে আছে সামান্থা লেইটার। ক্যামেরার ফোকাস ঠিক মতো করা হয়নি বলে মুখটা একটু ঝাপসা দেখাচ্ছে। তবে চেনা যায় সামান্থাকে।

'এর চেয়ে ভাল কোনও ছবি নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটাই সেরা। তোলা হয়েছে পাঁচ মাস আগে।'

'এমআই ফাইভ কী বলল, তাদের কম্পিউটার ব্যবহার করা নিয়ে?'

'ওরা জানিয়েছে অথরাইযেশন ছাড়া কেউ ওদের কম্পিউটার ব্যবহার করেনি। তবে আমাদের এক্সপার্টরা জানিয়েছে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এমআই ফাইভের কম্পিউটার হ্যাক করা সম্ভব, যদি নির্দিষ্ট কোড জানা থাকে কারও।'

ছবিটার দিকে আবার মনোযোগ দিল রানা। আরও কাছ থেকে দেখছে। হাসছে সামান্থা লেইটার। কোমর ছাড়িয়ে গেছে সোনালী চুলগুলো। বিকিনি টপের বাধা মানতে চাইছে না সুউন্নত স্তন যুগল। প্যান্টিটাও অত্যন্ত সরু। ফটোগ্রাফার নিশ্চয়ই তার খুবই পরিচিত কেউ। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছাড়া সাধারণত কোনও মেয়ে শরীর এতখানি উন্মুক্ত করে না।

'ছবিটা আপনাদের ল্যাবে বড় করা যাবে?'

'অবশ্যই!' বললেন লংফেলো। 'রবিবার হলেও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আজ আমাদের অফিস খোলা। সন্দেহজনক কিছু পেলে আমাকে জানিয়ো।'

মাথা দোলাল চিন্তিত রানা, বেরিয়ে এলো বিএসএস চিফের অফিস থেকে। এলিভেটরে করে ল্যাবে নেমে এলো ও। পরিচিত একজন টেকনিশিয়ানকে ছবিটা দিয়ে কী করতে হবে বলল–বিশ গুণ ব্লোআপ চায় ও।

'এক্ষুণি করে দিচ্ছি,' বলল টেকনিশিয়ান। 'দুই ভাগে করতে হবে কাজটা; পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।' ডার্করুমে ঢুকে পড়ল সে ছবি নিয়ে।

চার মিনিট পর দুটো ভেজা ব্লোআপ নিয়ে ফিরল সে, বলল, 'আমার নিজের জন্যেও এক কপি ছবি নেয়ায় একটু দেরি হয়ে গেল।'

মৃদু হাসল রানা, মূল ছবি আর ব্লোআপগুলো নিল। দেহের ওপরের অংশের ছবিটা কাছ থেকে দেখল ও। ওর পরিচিত সামান্থা লেইটারই, যদি না খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা যায়।

চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন ঠিক মেলে না। ঠিক কোথায় তফাৎ সেটা যদিও ধরতে পারল না রানা, তবে ওর মনে হলো সূক্ষ্ম কোনও তফাৎ আছে। এবার শরীরের নীচের অংশের ব্লোআপটা দেখল ও। ছবিগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে টেকনিশিয়ানকে বলল, 'এক্ষুণি মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁকে বলবেন আমি কেনসিংটনে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার সেক্রেটারি শাহানা আক্তারের বাসায় যাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব বিএসএস-এর

একটা টিম যেন ওখানে পাঠান উনি।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি...' কথা শেষ করতে পারল না টেকনিশিয়ান, তার আগেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

বুঝতে পারছে, একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ও।

একুশ

বিএসএস-এর একজন উপদেষ্টা হিসাবে মাসুদ রানাকে খুব ভাল করেই চেনে বেযমেন্ট গ্যারাজ-এর গার্ড। তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে সোজা একটা অ্যাস্টন মার্টিন-এ উঠে বসল রানা। রাবার পোড়ার কটু গন্ধে ভরে গেল গ্যারাজ। পিছলাচ্ছে অ্যাস্টন মার্টিনের চাকাগুলো। এক্সিট র‍্যাম্প পার হয়ে তীরের মতো বেরিয়ে এলো রানা গ্যারাজ থেকে, ছুটছে কেনসিংটন স্ট্রিটের দিকে। গম্ভীর চেহারাটা থমথম করছে ওর। ভাবছে, দেরি হয়ে যায়নি তো? শাহানা আর গিল্টি মিয়া মারাত্মক বিপদের মুখে আছে।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে নো পার্কিং যোনে গাড়িটা রেখে ছিটকে ভেতরে ঢুকল রানা, লিফটের বোতাম টিপে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করল। লিফট নেমে আসতেই ওটাতে করে উঠে এলো পাঁচতলায়। করিডরে বেরিয়ে সোজা ছুটল ও শাহানার ফ্ল্যাটের দিকে। বুকটা ওর ধক করে উঠল ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে।

মাথায় হাত দিয়ে দরজার কাছেই মেঝেতে বসে আছে গিল্টি মিয়া। রানাকে দেখে ওর মাথাটা নেমে গেল বুকের কাছে।

রানা আন্দাজ করতে পারছে কী ঘটেছে। 'কী হয়েছে, গিল্টি মিয়া? শাহানা আর সামান্থা কোথায়?'

'সব্বোনাশ হয়েচে, সার,' করুণ স্বরে বলল গিল্টি মিয়া, মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। 'মেমসায়েব বলল তার হাঁপানি বাড়চে, আমি যেন ওষুদের দোকান থেকে হাঁপানির স্প্রে কিনে লিয়ে আসি। সন্দো করিনি কিচু ঘটতে পারে, টাকা লিয়ে চলে গেচি দোকানে। ফিরে এসে দেকি সদর দরজাটা হাট করে খোলা। ডইংরুমের সোফা উল্টে পড়ে আচে। শাহানা আপা লেই। মেমসায়েবও লেই। দু'জনই উদাও। কারা যেন ধরে লিয়ে গেছে দুজনকে।'

করিডরে পায়ের আওয়াজ পেল রানা, এদিকেই এগিয়ে আসছে। তিনজন বিএসএস এজেন্ট ঢুকল দরজা দিয়ে। লোক পাঠাতে দেরি করেননি লংফেলো। তিনজনের একজনকে চেনে রানা, তরুণ এজেন্টের নাম রবার্ট উইলিয়াম। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

'দেরি হয়ে গেছে আমাদের,' বলল রানা। 'আমার সেক্রেটারিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল উইলিয়াম। দক্ষ এজেন্ট তারা প্রত্যেকে, রানাকে

বলতে হলো না, ফ্ল্যাট খুঁজে দেখতে শুরু করল তিনজন। থম মেরে বসে আছে গিল্টি মিয়া। ড্রইংরুমে এসে সোফায় বসল রানা, নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। সন্দেহ যখন করেইছিল এরকম কিছু ঘটতে পারে তো সামান্থাকে এখানে এনে না তুললেও পারত ও। গিল্টি মিয়া আর শাহানার জিম্মায় মেয়েটাকে না রেখে নিজের সঙ্গে রাখতে পারত। তা হলে এখন এরকম বাজে পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। চরম ভুল করেছে ও। নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না।

'মিস্টার রানা?' ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে উইলিয়াম। 'বাথরুমের কাঁচে এই মেসেজটা সাঁটা ছিল।' কাগজের টুকরোটা রানার হাতে দিল সে।

পড়ল রানা। 'দুই মহিলাই আমাদের জিম্মায়। যোগাযোগ করা হবে। জিনিসটা তৈরি রেখো, মাসুদ রানা।'

'জিনিসটা কী, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল উইলিয়াম।

'একটা টিউব।'

'টিউব?' ভ্রূ কুঁচকে গেল বিএসএস এজেন্টের।

'হ্যাঁ, একটা টিউব।'

'এখন কী করব আমরা?'

'অপেক্ষা।' দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ওরা এখানে ফোন করবে।' পাশের টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলল ও, মার্ভিন লংফেলোর নম্বরে ডায়াল করল। 'আমি পৌঁছানোর আগেই ধরে নিয়ে গেছে,' লংফেলোকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা।

'তা হলে তো এখন ফোনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' বললেন লংফেলো। 'ওরা যোগাযোগ করলে একা কিছু করতে যেয়ো না, সঙ্গে আমাদের কজন এজেন্টকেও রেখো।'

'আপাতত ফোন রাখছি,' হ্যাঁ-না কিছু বলল না রানা, রিসিভার নামিয়ে রাখল।

তিন ঘণ্টা পর বেজে উঠল ফোন। তখনও ফোনের পাশে স্থির বসে আছে রানা। ওর এক পাশে বসেছে বিএসএস-এর তিন এজেন্ট, আরেক পাশে রানা এজেন্সির পাঁচজন অপারেটার। হাতের তালু ঘামছে ওর। রিসিভার তুলল।

'মাসুদ রানা?' চাপা একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল। সম্ভবত রিসিভারে রুমাল চেপে ধরে কথা বলছে সে।

'বলছি।'

'টিউবটা নিয়ে একা আসতে হবে তোমাকে। যদি সঙ্গে আর কেউ থাকে তো খুন হয়ে যাবে মেয়ে দুটো, সেই সঙ্গে তুমি নিজেও। কোনও চালাকি করতে যেয়ো না। রাত আটটায়, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় ডকইয়ার্ডের একশো ষোলো নম্বর ওয়্যারহাউসে আসবে। ওখানেই পাবে পরবর্তী নির্দেশ। সেই নির্দেশ মত চলে আসবে আমার কাছে। মনে রেখো, কোনও চালাকি নয়।'

কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার প্রধান সৈকতের দিকে তাকাল রানা। মাথা নাড়ল সৈকত, মোবাইলটা পকেটে রাখল। 'টেলিফোন বোর্ডের ওরা জানাল একটা পে-ফোন বুদ থেকে কলটা এসেছে।'

'তা-ই তো করবে,' বলল রানা। 'ওরা প্রফেশনাল।'

'কোথাও ডেকেছে নিশ্চয়ই? যান আপনি,' বলল উইলিয়াম। 'দূর থেকে আপনার পিছু নেব আমরা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আগেই বলেছি ওরা প্রফেশনাল। ওদের কথা মতো কাজ করা না হলে বিনা দ্বিধায় খুন করবে ওরা। কেউ আমাকে অনুসরণ করবে, এ ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'কিন্তু...'

রিসিভারটা আবার তুলে নিয়েছে রানা। মার্ভিন লংফেলো ফোন ধরতেই বলল, 'ওরা যোগাযোগ করেছে, সার। একটা বিশেষ সময়ে, বিশেষ জায়গায় একা য়েতে হবে আমাকে। আমি চাই না বিএসএস-এর কেউ আমার পিছু নিক।'

'কিন্তু, রানা...

'আমি ঝুঁকি নিতে পারি না, মিস্টার লংফেলো। বিএসএস-এ ফুটো আছে– কথাটা আপনারই, তবে সেজন্যে নয়; ব্যাপারটা এখন রানা এজেন্সির ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের জড়িয়ে ফেলেছে ওরা।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন মিস্টার লংফেলো, তারপর বললেন, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু কারও সাহায্য না নিয়ে, একা তো আর যেতে পার না। কী করবে বলে ভাবছ?'

'একটা কিছু বুদ্ধি বের করে নেব, সার।'

'বেশ,' বললেন লংফেলো।

বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল রানা। অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত কিছু করার নেই ওর। মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে ওর কী আলাপ হয়েছে শুনে বিদায় নিয়ে চলে গেল বিএসএস-এর এজেন্ট তিনজন।

এরপর রানা এজেন্সির সবাইকে ওর প্ল্যানটা ভেঙে বলল রানা। সব শুনে চলে গেল ওরা। সৈকতের নেতৃত্বে সন্ধ্যার পর অত্যন্ত সাবধানে, কাকপক্ষীও যাতে টের না পায়, ডকইয়ার্ডে চলে যাবে ওরা। তারপর একশো ষোলো নম্বর ওয়্যারহাউসের আশপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। প্রয়োজনে ব্যাকআপ টিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

বাইশ

বিকেলে রানার জন্য হালকা নাস্তা কিনে নিয়ে এলো গিল্টি মিয়া, রানা জোর

করার পরও নিজে কিছু মুখে তুলল না। যা ঘটে গেছে তার জন্য এখনও নিজেকেই দায়ী ভাবছে ও। রানারও কোনও খাবার মুখে রুচল না। পড়ে থাকল সব।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় রানার সামনে এসে দাঁড়াল গিল্টি মিয়া। 'আমাকে একেনে দরকার আচে, সার? খুব খিদে পেয়েছে, আমি না হায় চারটে ভাত খেয়ে আসতুম।'

'ভাত?' অবাক হলো রানা। 'এখানে ভাত পাবে কোথায়?'

'সিলেটি খাইবেননি রেস্টুরেন্টে, সার। বাঙালি সবগুলো পদ খুব ভাল রাঁদে ওকেনে।'

'যাও।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল গিল্টি মিয়া।

আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, শাহানার ফ্ল্যাটে ফিরল না গিল্টি মিয়া, বোধহয় খাওয়া শেষ করতে পারেনি। ঠিক পোনে সাতটায় ফ্ল্যাটের দরজা লক করে নেমে এলো রানা নীচে, অ্যাস্টন মার্টিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো ডকইয়ার্ডের দিকে। ধীরেসুস্থে চলেছে।

ঠিক আটটার সময় একশো ষোলো নম্বর ওয়্যারহাউসের গেট থেকে একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে নামল ও। এদিক ওদিক চাইছে। এখানেই ওকে পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার কথা, কিন্তু কোথাও কোনও লোক দেখা যাচ্ছে না। তারপর আবছা আলোয় দেখতে পেল লোহার গেটের গায়ে লাল ইলেকট্রিকাল টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ছোট্ট একটা কাগজ। ওটা খুলে নিয়ে হেডলাইটের আলোতে পড়ল রানা।

ওটাতে লেখা আছে: রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণে এগোবে, তারপর ডানদিকের দ্বিতীয় গলিতে ঢুকবে। দুশো একত্রিশ নম্বর ওয়্যারহাউসে আসতে হবে তোমাকে। গেট দিয়ে কমপাউন্ডে ঢুকবে, ওয়্যারহাউসে ঢুকবে স্লাইডিং ডোর দিয়ে। আমরা তৈরি, কাজেই কোনও চালাকি নয়। কোনওরকম হামলা হলে প্রথমে মারা পড়বে তুমি, তারপর মেয়ে দুটোকে খুন করে সরে যাব আমরা। চলে এসো, মাসুদ রানা। আর এই কাগজটা পড়া শেষ হলেই পুড়িয়ে ফেলবে।

নির্দেশটা পালন করল রানা, পকেট থেকে লাইটার বের করে পুড়িয়ে ছাই করে দিল মেসেজটা। কাছেই কোথাও লুকিয়ে ওর ওপর নিশ্চয় নজর রাখছে বিশ্বাসঘাতক এজেন্টরা, এখনই তাদের কথার অন্যথা করা ঠিক হবে না।

কিন্তু সন্দেহ নেই যে সমস্যায় পড়ে গেল রানার ব্যাকআপ টিম। তারাও নিশ্চয় আশপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। কিন্তু যেহেতু জানে, প্রতিপক্ষের লোকজন রানার উপর নজর রাখছে, সেহেতু ইচ্ছে হলেও এই মুহূর্তে তারা তাদের মাসুদ ভাইকে অনুসরণ করতে পারবে না। একই কারণে ওদের প্রতি কোনও ইঙ্গিত করতে পারবে না রানাও।

আবার গাড়িতে উঠে নির্দেশ মতো এগোল রানা, চোখ রিয়ারভিউ

মিররে। কেউ অনুসরণ করছে না। ওর পিছনের রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই। ডানদিকের দ্বিতীয় সরু, নির্জন গলিতে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ওর অ্যাস্টন মার্টিন। দু'পাশে ওয়্যারহাউসের সারি। দেখে পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। দুশো পঁচিশ নম্বর ওয়্যারহাউসের কাছাকাছি রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে অ্যাস্টন মার্টিনটা রাখল ও, ঠিক করেছে বাকি পথ হেঁটে যাবে। রানা এজেন্সির অপারেটারদের কিছুটা সময় পাইয়ে দিতে চায় ও, তারা যাতে একটু দেরি করে হলেও ওর পিছু নিতে পারে।

ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে দশ মিনিট পর দুশো একত্রিশ নম্বর ওয়্যারহাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও। দশ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ওয়্যারহাউসের বিরাট কম্পাউন্ডটা ঘেরা। গেটটা নিরেট ইস্পাতের, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা দুটো।

ওই গেট দিয়ে ঢোকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পিছনদিকে চলে এসে ওয়্যারহাউসের চারপাশটা ভাল করে দেখছে রানা। কেউ কোথাও নেই। কিছু নড়ছেও না। কান পাতল। কোনও শব্দ নেই কোথাও। হঠাৎ মনে হলো ওয়্যারহাউসের তেতলায় আলোর ক্ষীণ একটু আভা দেখতে পেয়েছে ও। সত্যি দেখেছে, নাকি চোখের ভুল?

ভুল দেখুক আর ঠিক, রানা সিদ্ধান্ত নিল পাঁচিল টপকে কমপাউন্ডের ভিতর ঢুকবে। পাঁচিলের কাছ থেকে দশ ফুট পিছিয়ে এল ও। তারপর দৌড়ে তিন কদম গিয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল পাঁচিলের মাথা। দু'হাতের জোরে নিজেকে টেনে তুলল ও। প্রথমে মাথাটা সামান্য উঁচু করে ওপাশটা দেখল খুঁটিয়ে। পাঁচিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাঝারি আকারের অনেকগুলো গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর মাঝখানে ঘন ঝোপঝাড় জন্মে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, একফালি চাঁদের ঘোলাটে আলোয় কম্পাউন্ডের কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না ওর। না, অন্য কোনও আলোর আভাসও নেই কোথাও। এমন হতে পারে তেতলায় কেউ হয়তো এক সেকেন্ডের জন্য টর্চ জ্বেলেছিল। সাবধানে দেয়ালের ওপর শরীরটা ওঠাল ও, তারপর লাফ দিয়ে নামল একটা ঝোপের পাশে। ধুপ করে মৃদু একটা আওয়াজ হয়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

ঝিঁঝি ডাকছে, এছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। পাঁচিল ঘেঁষে নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে ও, ধীরে ধীরে ওয়্যারহাউসের সামনের দিকটায় পৌঁছাচ্ছে। একটু পরেই খানিকটা বামে ওয়্যারহাউসের ভেতরে ঢোকার প্রকাণ্ড স্লাইডিং গেটটা দেখতে পেল। বন্ধ। ওটা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করা আর যেচে নিজের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা, একই কথা। অন্য কোনও পথে ঢুকতে হবে ওকে।

ওয়্যারহাউসটা তিনতলা। শুধু কি ভেতরেই আছে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি? ফায়ার এস্কেপ থাকবে না? ওটা তো বাইরের দিকে থাকার কথা। দেখাই যাচ্ছে ওয়্যারহাউসের সামনের দিকে নেই সিঁড়িটা। তা হলে বোধহয় ডান পাশে কোথাও আছে। ঝোপের ভিতর দিয়ে, স্লাইডিং ডোরটাকে পাশ কাটিয়ে

ওয়্যারহাউসের ডানদিকে যাবার জন্য পা বাড়াল ও।

মাত্র দু'পা গিয়েই জমে যেতে হলো ওকে ধাতব একটা ক্লিক শব্দ শুনে। খুব কাছেই পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করা হয়েছে। সামনের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো এক ছায়ামূর্তি। রানার ঠিক ছ'ফুট দূরে থামল সে। ডান হাতে ধরা নাইন এমএম ল্যুগার পিস্তলটা সোজা রানার বুকে তাক করা।

'এসেছ তা হলে, মাসুদ রানা! গুড। পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে টিউবটা বের করে মাটিতে নামিয়ে রাখো।'

গলাটা চেনে রানা। বেশ কয়েকবারই আলাপ হয়েছে ওর বিএসএস এজেন্ট ডিক চেইনির সঙ্গে। ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি লোক চেইনি, নিজের কাজে দক্ষ। ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। দেহের পাশ থেকে ওয়ালথারটা তুলে গুলি করার সুযোগ পাবে না রানা, তার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুক। কোনওদিকে ঝাঁপ দিয়েও লাভ নেই। এত কাছ থেকে ফস্কাবে না চেইনির মতো পাকা মার্কসম্যানের গুলি।

হাত থেকে ওয়ালথারটা ছেড়ে দিল রানা। 'তুমিও, চেইনি? নিজের দেশের সঙ্গে তুমিও বেঈমানি করলে?'

নিচু স্বরে হাসল চেইনি। 'আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা কোরো না, মাসুদ রানা। টিউবটা বের করো।'

'তোমার নিজেকেই বের করে নিতে হবে,' বলল রানা। বুঝে ফেলেছে, কথা বলে সময় নষ্ট করবে না অভিজ্ঞ এজেন্ট চেইনি। সামান্যতম অন্যমনস্ক করা যাবে না ওকে। সামনাসামনি মোকাবিলা ছাড়া আর কোনও উপায়ান্তর নেই। চেষ্টা করে দেখতে চাইল ওকে কাছে আনা যায় কি না। 'ওটা পেলেই আমাকে খুন করবে তুমি। কাজেই তোমার জন্যে কড়ে আঙুলও নাড়াব না আমি। গুলি করলে করো।'

ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন রীতিমতো অসহায় বোধ করছে রানা। ওর মতো একই মানের ট্রেনিং পাওয়া এক লোকের মুখোমুখি হয়েছে ও, এবং ওর হাত দুটো দেহের দু'পাশে ঝুলছে। কাজেই মৃত্যুর কথাই ভাবছে ও, আক্রমণের কথা ভাবছে না। ভয়ে পিস্তলটা তো আগেই ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে।

'তা হলে তোমাকে মেরেই ওটা নিতে হচ্ছে, রানা,' শীতল কণ্ঠে বলল চেইনি।

আলগোছে স্টিলেটো চলে এলো রানার হাতে।

চাঁদের আবছা আলোয় চেইনির পিস্তল ধরা হাতটা একটু নড়ে উঠতে দেখল ও। শেষ মুহূর্তে কী করতে হবে জানা আছে ওর। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়বে রানা, একই সঙ্গে ছুঁড়বে স্টিলেটো চেইনির কণ্ঠা লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আর সময় পাওয়া গেল না।

'ঠাস্!'

একটা কাতর গলা শুনতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য বোকা হয়ে গেল রানা।

'ও, গশ্!'

হাত থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল চেইনির লুগার। দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বসে পড়েছে লোকটা। চাঁদের আলোয় তার দু'হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে কালো কী যেন গড়িয়ে নামতে দেখল ও। রক্ত! দেরি না করে এক লাফে আহত চেইনির পাশে চলে গেল রানা, প্রচণ্ড একটা কারাতে চপ মারল তার ঘাড়ে। জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল বেঈমান লোকটা।

চারপাশে তাকাল রানা। কোথাও কেউ নেই। হলোটা কী তা হলে? তারপর পনেরো ফুট দূরে ডানপাশের একটা গাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে একটা ছোটখাটো ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। ছায়ামূর্তির ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে খানিকটা লম্বা। ঝুঁকে ওয়ালথারটা তুলে নিল সতর্ক রানা। ওটা এমন ভাবে ধরল যাতে দেরি না করে গুলি করতে পারে।

যে আসছে তার হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল ওর কাছে। চাঁদের আলো ছায়ামূর্তির মুখে পড়তেই গিল্টি মিয়ার সরল, নিষ্পাপ চেহারাটা চিনতে অসুবিধে হলো না ওর।

'তুমি!' বিস্ময় চেপে বলল রানা। 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

'আপনার সাতেই তো এয়েচি, সার,' এক গাল হাসল গিল্টি মিয়া। 'পেচনের ডালার ভেতর শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে লাট সায়েবের মত আরাম করে চলে এলুম। তবে মাতায় একবার জোর ঠোক্কর খেয়েচি।'

'তার মানে আসলে তখন ভাত খেতে যাওনি, আমার গাড়ির বুটে গিয়ে ঢুকেছ?' গিল্টি মিয়া ওর নির্দেশ মানেনি যদিও, কিন্তু রাগতে পারছে না রানা. বিপদের সময় যাকে পাশে পাওয়া যায় তার উপর রাগ করা যায় না।

'না, সার, আপনার সাতে কি মিচে কতা বলা যায়? নাকেমুকে দুটো গুঁজে তবেই উটেচি। কিন্তু দুক্খের কতা কি জানেন, সার, আমার ওস্তাদ জানলে আমাকে ত্যাজ্য শিষ্য করে দিত। ডালার তালা খুলতে পুরো আড়াই মিলিট লেগেচে আমার।' আফসোস করে মাথা নেড়ে বেঢপ চেহারার পিস্তলটা রানাকে দেখাল সে। আসলে এয়ারগান ওটা, তবে সীসের গুলির বদলে বাচ্চাদের মার্বেল ছোঁড়ে। গিল্টি মিয়া আসল পিস্তল একেবারেই হাতে নিতে চায় না বলে বিসিআই এক্সপার্টরা এই স্টানগান তৈরি করে দিয়েছে ওকে। 'ডাকটার শামশের আলী এটেকে ভায়ানক করে তুলেচেন, সার,' অভিযোগের সুরে বলল গিল্টি মিয়া। 'আগে পেস্তলটা থেকে গুলি করলে লোকের মাতায় আলু গজাত। অ্যাকোন সার একাবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। কোন্‌দিন না জানি খুন-খারাবির দায়ে ফেঁসে যাই। চুরি সে আলাদা কতা, রহিম দারোগা পোঁদে গোটা দুই লাত মেরে কোটে চালান করে দিত, ওপরের উনি নাহায় চারটে লাত মেরে ভেস্তে পাটিয়ে দেবেন। কিন্তু খুন, সার? নিগ্‌ঘাৎ নরকবাস! আগুনে পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে...'

না থামালে থামবে না গিল্টি মিয়া, কাজেই মাটিতে পড়ে থাকা অচেতন দেহটা দেখিয়ে রানা বলল, 'এ-লোকের হাত দুটো বেল্ট দিয়ে আচ্ছামত বেঁধে ফেলো। মুখে কাপড় গুঁজে দেবে। পা দুটো জুতোর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে

দিয়ে আড়াল থেকে পাহারায় থাকবে। সাবধান, চারপাশে এদের আরও লোক থাকতে পারে।'

'আপনার কতা কি না শুনে পারি, সার? এ ব্যাটাকে বেঁদে ঝোপের মদ্যে ফেলে রেকে আমি একেবারে অন্দোকারে মিশে যাব।' কাজে লেগে পড়ল গিল্টি মিয়া। বাঁধাছাঁদা শেষ করে পকেট থেকে রুমাল বের করে গুঁজে দিল ডিক চেইনির মুখে। এবার জিজ্ঞেস করল, 'আর আপনি কী করবেন, সার?'

'ওয়্যারহাউসের ভেতর ঢুকব,' বলল রানা। 'শাহানাকে খুব সম্ভব তেতলায় বন্দি করে রেখেছে।'

'আর মেমসায়েব?'

'তার জন্যেও আমাকে ওখানে ঢুকতে হবে।'

'আমি সাতে আসি, সার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, তুমি এখানেই আমার বেশি কাজে আসবে।' বলল না খেলনা পিস্তল ব্যবহারকারী গিল্টি মিয়াকে জেনেশুনে ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলতে চায় না ও কিছুতেই।

ওয়্যারহাউসের পাশে যাবার জন্য পা বাড়াল রানা, এবার ওয়ালথারটা ওর দেহের পাশে ঝুলছে না, মানুষের বুক সমান উচ্চতায় স্থির হয়ে আছে ওটার নীলচে কালো নল।

গিল্টি মিয়া নীরবে অনুসরণ করল ওকে।

সাবধানে বেশ অনেকটা জায়গা ঘুরেফিরে দেখল ওরা, ওয়্যারহাউসের এদিকটাতে কেউ নেই।

ফায়ার এস্কেপের একটা লোহার মই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মইটা উঠিয়ে রাখা হয়েছে, শেষ ধাপটা দশ ফুটের বেশি উপরে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'আমি বসছি, আমার কাঁধে উঠবে তুমি, গিল্টি মিয়া। সাবধানে মইটা টেনে নামাবে, কোনও আওয়াজ যেন না হয়।'

দাঁত দিয়ে জিভে কামড় দিল গিল্টি মিয়া। 'সার, এ কী কতা! সুযোগ পেলেই আপনার মাতায় উটব? এতবড় বেয়াদপি আমি করতে পারব না, সার। ধম্মে সইবে না।'

বসে পড়ল রানা। 'নিজেকে না হয় বাঁদর মনে করো, আর আমাকে বাঁদরওয়ালা, ঠিক আছে? ধরে নাও উকুন বাছতে উঠছ। দেরি কোরো না, ওঠো জলদি।'

ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত রানার কাঁধে চড়ে বসল গিল্টি মিয়া। রানার মনে হলো গিল্টি মিয়ার ওজন চড়ুই পাখির চেয়ে খুব একটা বেশি হবে না। সাবধানে মইটা নামাতে শুরু করল গিল্টি মিয়া। প্রতিবার সিকি ইঞ্চি করে নামাচ্ছে। খুবই মৃদু কিরকির করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, তবে আওয়াজটা দশ ফুট দূর থেকেও শোনা যাবে না।

পুরো নয় মিনিট পর মাটি স্পর্শ করল মইয়ের শেষ ধাপ আর দু'পাশের রড। মাঝপথ থেকে রানাও সাহায্য করেছে গিল্টি মিয়াকে।

'এবার ফিরে গিয়ে ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করো,' গিল্টি মিয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নির্দেশ দিল রানা। 'কোনও ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

'আচ্ছা, সার।' পনেরো সেকেন্ড পার হবার আগেই গিল্টি মিয়ার ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

মইটা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, দোতলার বারান্দায় উঠে মইটা আবার টেনে তুলে নিল সাবধানে। এখন কম্পাউন্ডে টহল দিতে এসে কেউ দেখলে মইটা ব্যবহার করা হয়েছে বলে সন্দেহ করবে না।

বারান্দায় বের হবার একটা দরজা চোখে পড়ল ওর। নব মোচড়াতেই ঘুরল ওটা, কিন্তু ঠেলা দিতে দরজাটা খুলল না। ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকানো। আরেকটু এগোল রানা, কাঁচের একটা স্লাইডিং জানালার সামনে থামল। নীচের স্লাইডটা ওপরে ঠেলতেই উঠতে শুরু করল ওটা। নিঃশব্দে জানালা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ছোট একটা অফিস এটা। অন্ধকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রানা চোখ দুটোকে আঁধারে সইয়ে নিতে। একটু পর দরজার কাঠামোটা দেখতে পেল। খোলা ওটা। করিডরে বেরিয়ে এলো ও। করিডরের একধারে পাশাপাশি অনেকগুলো ছোট অফিসঘর। সিঁড়িটা কোথায়? গোলাগুলি শুরু হবার আগে শাহানাকে খুঁজে পেলে ওকে সরিয়ে দেয়া যেত। সেটাই ভাল হত। কিন্তু ওয়্যারহাউসটা অনেক বড়, খুঁজতে গেলে যে-কোনও সময় ওর অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের নজরে পড়ে যেতে পারে।

করিডর ধরে সামনে বাড়ল রানা। কোনও কোনও অফিসের দরজা বন্ধ, আবার কোনওটার খোলা। ওগুলোর ভেতর আসবাবপত্র নেই। খালি। বন্ধ দরজাগুলোর তলার সরু ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাও বের হচ্ছে না। করিডরের শেষে চলে এলো রানা। সামনে খোলা একটা দরজা। তারপরেই চওড়া সিঁড়ি।

মেয়েরা সম্ভবত ওপরে থাকবে, কিন্তু তাদের খোঁজার চিন্তাটা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষ ওকে ঠিক কোথায় আশা করবে। খানিকটা নামতেই একটা ল্যান্ডিঙে পৌঁছে গেল ও। ল্যান্ডিং থেকে শুরু হয়েছে দেড়তলা সমান উঁচু ক্যাটওয়াক–ইস্পাতের তৈরি সরু ব্রিজ, মাল-সামান গুছিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। নীচে আলোর আভাস পাবার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল ও। না, কোনও আলো নেই, ওয়্যারহাউসের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নীচে যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তা হলে অন্ধকারেই অপেক্ষা করছে।

ওকে ওয়্যারহাউসের স্লাইডিং ডোর দিয়ে ঢুকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রানা আন্দাজ করল, ক্যাটওয়াক ধরে এগোলে স্লাইডিং ডোরের কাছে চলে যেতে পারবে ও। তবে এতে ঝুঁকি আছে মারাত্মক। এই ক্যাটওয়াকের সামনের দিকে আততায়ী থাকতে পারে। ডানপাশের সমান্তরাল ক্যাটওয়াকেও থাকতে পারে কেউ।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না রানা, ওয়ালথার হাতে নিঃশব্দে এগোল সামনে। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, ধরে নাও তুমি শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটছ, কিন্তু কোনও আওয়াজ করা চলবে না। সামান্যতম যেন না কাঁপে ক্যাটওয়াক। সামনে কেউ থাকলে কাঁপুনিটা টের পাবে সে। একই সঙ্গে সামনে এবং নীচে চোখ বোলাচ্ছে রানা, এগোচ্ছে একটু পাশ ফিরে।

একটু পর সামান্য একটা চকিত আলো দেখতে পেল নীচে, মেঝের কাছে। থমকে দাঁড়াল ও আলোটা আবার দেখার জন্য। আবার ক্ষণিকের জন্য আলোটা জ্বলতে দেখে বুঝতে পারল টর্চের সামনে হাত রেখে সুইচ অন করেছে কেউ সে যে-ই হোক, দু'বার তার আঙুল অসাবধানে সামান্য বেশি ফাঁক হয়ে গেছে

তার মানে নীচে অন্তত একজন আছে।

সামনের দিকে মনোযোগ দিল রানা, পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বেশ খানিকটা সামনে খুদে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে যেতে দেখল। নীচ থেকে আলো জ্বেলে জবাব দেয়া হলো। বোধহয় পেন্সিল টর্চ দিয়ে নিজেদের ভেতর যোগাযোগ রাখছে আততায়ীরা। এবং ভুল করছে। রানা এখন জানে তারা কে কোথায় আছে।

কিন্তু এই দু'জনই আছে, না এজেন্টরা সংখ্যায় আরও বেশি? নড়ল না রানা। আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও, অ্যাম্বুশ পাতলে তৃতীয় লোকটাকে কোথায় থাকতে বলত। আরও আলো দেখার জন্য অপেক্ষা করল ও। কিন্তু আর কোনও আলো জ্বলল না। আরও কেউ যদি থেকে থাকে তা হলে সে আলো জ্বালছে না।

শামুকের মতো শ্লথ গতিতে এগোল রানা, নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা ভুলেও মনে ঠাঁই দিচ্ছে না। সামনের লোকটাকে খুন করতে চায় না ও। তাকে বন্দি করতে পারলে মেয়েরা কোথায় সেটা জানা যাবে। অথবা বাধ্য হয়ে খুন যদি করতেই হয় তা হলে নীচের লোকটার কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে হবে। সেটা কঠিন হবে। ও-পর্যন্ত যাবার আগেই ওকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে লোকটা।

পনেরো ফুট যাওয়ার পর ক্যাটওয়াকের রেইলিং ধরে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখতে পেল রানা, খানিকটা কুঁজো হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে লোকটার দূরত্ব পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। এখন সামনে বেড়ে লাথি মেরে ব্যাটাকে নীচে ফেলতে পারে ও, কিন্তু তা হলে নীচের লোকটা সতর্ক হয়ে যাবে। ওয়ালথারটা রানার জ্যাকেটের পকেটে চলে গেল, ডান হাতে বেরিয়ে এলো স্টিলেটো। পৌঁছে গেল ও লোকটার পিছনে, স্টিলেটোর ডগা তার বাম কানের পেছনে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। রানা হাতের চাপ বাড়াল খানিকটা, যতক্ষণ না স্টিলেটোর চোখা ডগার খোঁচায় চামড়া ফুটো হয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের হলো। ফিসফিস করল রানা, 'একটুও নড়বে না।' এক হাতে সার্চ শুরু করল ও, কয়েক সেকেন্ড পর লোকটার কোমরে গোঁজা অটোমেটিকটা নিয়ে নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল।

'সামনে কি নীচে নামার সিঁড়ি আছে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'আছে,' জবাবটাও ফিসফিস করে দেয়া হলো।

'আগে বাড়ো। কোনও শব্দ নয়।'

স্টিলেটোর খোঁচা খাবার ভয়ে মাথা নাড়ল না লোকটা, এমন ভাবে হাঁটতে শুরু করল, যেন ভাঙা কাঁচের ওপর দিয়ে খালিপায়ে হাঁটছে। সিঁড়ির কাছে চলে এলো রানা তাকে নিয়ে। এক পা পিছনেই আছে ও। গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'চালাকি করলে খুন হয়ে যাবে। নামতে শুরু করো। আমি যেই তোমার কাঁধে টোকা দেব, তুমি তোমার সঙ্গীকে বলবে তার সঙ্গে কথা বলতে আসছ।'

'আচ্ছা।'

পিঠে ঠেলা দিয়ে লোকটাকে নামতে ইশারা করল রানা। নেমে এলো ওরা ওয়্যারহাউসের মেঝেতে। সঙ্গীর দিকে হাঁটছে রানার বন্দি। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় ওই লোকটার আকৃতি আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা, একটা পিলারের খানিকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনের লোকটার কাঁধে দুটো টোকা দিল রানা।

'রেইলি, আমি আসছি,' স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ জোরে কথা বলে উঠল লোকটা। রেইলি নাম, দ্রুত ভাবল রানা, তার মানে সম্ভবত বিএসএস নয়, অন্তত এ নামে ওর পরিচিত কেউ নেই বিএসএস-এ। বোধহয় এমআই ফাইভের এজেন্ট।

'জিযাস!' আঁৎকে উঠল অন্য লোকটা। 'চমকে দিয়েছ তুমি আমাকে!' টর্চটা জ্বেলে সঙ্গীর দিকে আলো ফেলল সে। পরক্ষণেই রানার চেহারা দেখে বলে উঠল, 'আরে, ও তো...'

দেরি না করে বেল্টে গোঁজা অটোমেটিক পিস্তল বের করেই সজোরে সামনের লোকটার মাথায় নামিয়ে আনল রানা। উপুড় হয়ে ধপ করে মেঝেতে পড়ল তার অজ্ঞান দেহটা। নাকটা ছেঁচে যাওয়ায় থ্যাচ করে বিশ্রী একটা আওয়াজ হলো। দ্বিতীয় লোকটা আর রানার মাঝে এখন কোনও আড়াল নেই। একই সঙ্গে পিস্তল তুলল দু'জন। চমকটার কারণেই হয়তো রানার চেয়ে ট্রিগার স্পর্শ করতে দেরি হয়ে গেল লোকটার। হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল এমআই ফাইভের মৃত এজেন্ট। মাটিতে পড়ে গুলি বের হলো তার পিস্তল থেকে। দূরের একটা পিলারে গিয়ে লাগল বুলেট।

জ্ঞান ফিরছে প্রথম লোকটার। গুঙিয়ে উঠল। পাছায় প্রচণ্ড একটা লাথি দিয়ে তাকে চিৎ করল রানা। মড়াৎ আওয়াজ করে ভেঙে গেল পতিত শত্রুর একপাশের হিপবোন। টর্চটা তুলে নিয়ে এবার লোকটার ব্যথায় বিকৃত মুখে আলো ফেলল ও। পরক্ষণেই মৃদু শিস বাজাল। বিএসএস-এর সাধারণ কোনও এজেন্ট নয় এ, স্বয়ং বিএসএস ডেপুটি চিফ জেমস বেকার!

ফার্মহাউসে বলা উইলিসের শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। 'শালার বে...' বলেছিল সে। বলতে চেয়েছিল বেকার। বিল টাকার আর জেমস বেকার মিলে ভালই একটা র‍্যাকেট গড়ে তুলেছিল।

'মেরে ফেলো,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল লোকটা।

'পরে ভেবে দেখব,' শীতল কণ্ঠে বলল রানা। 'শাহানা আক্তার কোথায়?'

'জানি না।'

স্টিলেটো চলে এসেছে রানার হাতে, ওটার ডগার এক খোঁচা দিয়ে লোকটার নাকের একটা ফুটো বেশ খানিকটা বড় করে ফেলল রানা। 'বলবে, না এক এক করে তোমার নাক-কান কেটে নামাব?' নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো শোনাল ওর কণ্ঠ।

'ওপরে,' বলল বেকার। 'ওপরে বন্দি করে রেখেছি ওদের। তিনতলায়।'

পিস্তলটা তুলে আবার সজোরে বিশ্বাসঘাতক লোকটার খুলিতে নামিয়ে আনল রানা। মাপা মার, অন্তত দু'ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরবে না জেমস বেকারের।

বিতৃষ্ণা নিয়ে অচেতন লোকটাকে একবার দেখে সিঁড়ির কাছে ফিরে এলো রানা, দ্রুত উঠতে শুরু করল ধাপ বেয়ে। আগেই নিভিয়ে পকেটে রেখে দিয়েছে টর্চ। ক্যাটওয়াক পার হয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ির কাছে চলে এলো ও, তারপর ওর হাঁটার গতি কমে গেল, নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙছে এখন।

তিনতলার করিডরের বামপাশে পরপর তিনটে ঘর তালাবন্ধ। চতুর্থ ঘরের দরজাটা সামান্য খোলা। মৃদু আলো বের হচ্ছে ওই দরজা দিয়ে। এই আলোই চোখে পড়েছিল ওর দেয়ালের বাইরে থেকে। সামান্থার গলা শুনতে পেল ও। তিক্ত স্বরে বলছে, 'কতবার করে বললাম একটা রিচার্জেবল লাইট দিতে, অথচ দুটো মোমবাতি দিয়ে গেল গাধাগুলো!'

ওয়ালথারটা বের করে হাতে নিল রানা, তারপর দৃঢ় পায়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। খানিকটা তফাতে দুটো চেয়ারে বসে আছে শাহানা আর সামান্থা। সামান্থার পায়ে দড়ি প্যাঁচানো। হাত দুটো পিছনে। শাহানার তা নয়, ওর বাঁধা হাত দুটো কোলের উপর। মুখে কাপড় গোঁজা।

রানাকে দেখে বড় বড় হয়ে উঠল সামান্থার মায়াবী বাদামি চোখ দুটো। 'রানা! ক্রাইস্ট! আমরা তো ভেবেছিলাম···থ্যাঙ্ক গড তুমি এসেছ!'

'নাম কী তোমার?' নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'মানে, রানা?' অবাক চোখে রানার দিকে তাকাল সামান্থা।

শাহানার উপস্থিতির কারণে রানা বলতে পারল না আসল সামান্থা লেইটারের তলপেটে বড় একটা লাল জন্মদাগ ছিল, যেটা নকল সামান্থা লেইটারের নেই। 'অনেক আগেই তোমাকে সন্দেহ করেছি আমি,' বলল রানা। 'মনে আছে, তোমার পিস্তলটা পরিষ্কার করেছিলাম? তুমি ভান করছিলে ওটার ব্যবহার ভাল মতো জানো না। তা হলে ওটার নলের ভেতর অত করডাইট জমে কী করে? ব্রিটেনের অস্ত্র আইন খুব কড়া। তোমার পিস্তল থেকে আর কেউ শত শত গুলি করবে সেটা ছিল একেবারেই অসম্ভব। তার মানে তুমিই প্র্যাকটিস করেছ। অথচ ভান করেছিলে পিস্তলটা রিলোড করতেও জানো না।'

'আমি যদি সামান্থা লেইটারই না হই, তা হলে তোমাকে খুন করার এতো সুযোগ পেয়েও খুন করলাম না কেন?' একদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে মেয়েটা।

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' বলল রানা। 'এবং ভেবে দেখেছি এর একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে, যে-কারণে তুমি আমাকে খুন করোনি। তোমার বস্ বিল টাকার আর বিএসএস ডেপুটি চিফ জেমস বেকারের মধ্যে খানিকটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বিল টাকার চাইছিল আমি ডক্টর হপকিন্সকে খুঁজে বের করি, তারপর তুমি আমাকে খুন করবে। আর বেকার চাইছিল বেঈমান এজেন্টরা আমাকে খুন করে টিউবটা সংগ্রহ করুক। বেকারের বোধহয় ধারণা হয়েছিল আগে হোক পরে হোক সে ঠিকই ডক্টর অলিভার হপকিন্সকে মুঠোর মধ্যে পাবে।' রানার হাসিটা নিষ্ঠুর দেখাল। 'আমি কি ঠিক বলেছি মিস...? এবার তোমার নামটা বলে ফেলো।'

চোখের ইশারায় রানাকে কী যেন বলতে চাইছে শাহানা।

'তুমি কি পাগল হলে, রানা?' শরীর মোচড়াল নকল সামান্থা, যেন হাতের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করছে। তার চোখ সরছে না রানার ওপর থেকে। হঠাৎই যেন বুঝতে পারল ধরা পড়ে গেছে সে, ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই সামনে দাঁড়ানো এই কঠোর সুপুরুষ লোকটাকে।

'তোমার নাম?' কঠোর শোনাল রানার গলা।

'ফারা ফার্গুসন,' হিসহিস করে বলল নকল সামান্থা। 'আসলটাকে আমরা চার মাস আগেই পুঁতে দিয়েছি।'

'প্ল্যাস্টিক সার্জারি?'

'মিল আগে থেকেই ছিল, বাকিটা, হ্যাঁ।'

'বিল টাকারের সাহায্য পেয়েছ বলেই সম্ভবত কেউ ধরতে পারেনি তুমি নকল?'

'কম্পিউটারের ওপর বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়েছিল আমাকে। টাকারের তুরুপের তাস ছিলাম আমি।'

'বিল টাকার আর জেমস বেকার ধরা পড়ে গেছে, ফারা। সেই সঙ্গে তুমিও।' পিস্তলটা নামিয়ে নিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে শাহানার চোখ বিস্ফারিত হলো। তাকে আরও অবাক করে দিয়ে আবার বলল রানা, 'তুমি শুধু শুধু হাত দুটো পেছনে লুকিয়ে রেখেছ, ফারা। আমি জানি ওগুলো বাঁধা নয়। এ-ও জানি যে তোমার হাতে পিস্তল আছে। বোকার মত আচরণ না করে আমি কী বলি শোনো–সারেন্ডার করো।'

'জানতাম তুমি কোনও মেয়েকে গুলি করবে না,' মৃদু হাসল ফারা ফার্গুসন। ঝট্ করে হাত দুটো সামনে নিয়ে এলো সে। ওগুলো সত্যিই বাঁধা ছিল না! তার ডান হাতে ·২৫ বেরেটা অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে, সরাসরি রানার বুকে তাক করা।

ভ্রু কোঁচকাল রানা। 'ওটা আমাকে দাও,' বলে খালি হাতটা বাড়াল ও।

গুলি করল ফারা। কিন্তু কোনও বুলেট বেরুল না।

হেসে উঠল রানা, নিজের পিস্তল পকেটে ভরে রাখছে। 'তুমি ওদের লোক বোঝার পরও তোমার কাছে পিস্তলটা কেড়ে নিইনি আমি, কেন?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফারার চেহারা। 'কেন?'

'আমি ওটার পিন খুলে রেখেছি।' শাহানার হাতের বাঁধন খুলে দিল রানা। 'তোমার রশি দিয়ে ওর হাত দুটো শক্ত করে বাঁধো,' শাহানাকে নির্দেশ দিল ও।

'কখন?' জিজ্ঞেস করল ফারা, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'কখন জানতে পারলে?'

'বলতে পার প্রথম থেকেই।'

এই সময় বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'মাসুদ ভাই, আমরা পৌঁছে গেছি।' এক মুহূর্ত পর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা এজেন্সির দুজন সশস্ত্র অপারেটার।

ইতোমধ্যে ফারার হাত দুটো বেঁধে ফেলেছে শাহানা।

'কীভাবে এলে তোমরা?' জানতে চাইল রানা। 'আমার পিছু নেয়া তো সম্ভব ছিল না।'

'না,' অপারেটারদের একজন জবাব দিল। 'আমরা আপনাকে নয়, মাসুদ ভাই, গিল্টিমিয়ার পিছু নিয়ে এখানে পৌঁছেছি।'

'ভেরি গুড। সৈকত কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'কমপাউন্ডের চারদিকে তল্লাশি চালাচ্ছেন।'

'বিএসএস এজেন্টরা না আসা পর্যন্ত একটা কামরায় আটকে রাখো বন্দিদের,' ওদেরকে নির্দেশ দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

করিডরে থামল ও, পকেট থেকে সেল ফোন বের করে মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে যোগাযোগ করল। ওর ফোন পাওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন ভদ্রলোক। দু'চার কথায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা, বলল দুশো একত্রিশ নম্বর ওয়্যারহাউসে যেন চলে আসে বিএসএস এজেন্টরা।

শাহানাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ও বাইরের কম্পাউন্ডে। আরেকটা চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্য। শাহানা আর ও বেরিয়ে আসতেই ঝোপের ভেতর থেকে একজনকে সামনে নিয়ে বের হয়ে এলো গিল্টি মিয়াও।

'সার, এটেকে ঝোপের মদ্যে পেয়েছি।'

আগে দুয়েকটা পার্টিতে দেখা হওয়ায় বিল টাকারকে চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না রানার। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে ধরলে, গিল্টি মিয়া?'

'ঝোপের মদ্যে সার মুত্তির মতো ডেঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু গায়ের ওই ভূতের মতো সাদা রং নুকোবে কোতায়? ব্যাটার পেচনে গিয়ে খুলিতে পেস্তলটা চেপে ধরে বললুম, নড়েচ কী মরেচ। হে-হে, বাওয়া! আমি হচ্চি গে-' রানা বিরক্ত হচ্ছে টের পেয়ে প্রসঙ্গে ফিরে গেল সে, 'ব্যাটা আর পেচনে তাকাবার সাওস পেলে না। ভিতুটার কোমরে গোঁজা পেস্তলটা বের করে ঝোপের মদ্যে ফেলে দিলুম। আসল জিনিস ছেল তো, ওটা আর সঙ্গে রাকিনি। পরে খুঁজে লেবে পুলিশ। তারপর থেকে সার অপেক্কা করচি আপনি এলে ব্যাটাকে আপনার হাতে

তুলে দেব।'

এই সময় ঘন ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সেদিকে ভাল করে তাকাতে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার প্রধান সৈকত সামাদকে চিনতে পারল রানা। তার সঙ্গে আরও চারজন লোক রয়েছে। চারজনের দুজন শ্বেতাঙ্গ, হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো, দুজনেই খোঁড়াচ্ছে। বাকি দুজন রানা এজেন্সির অপারেটার।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সৈকত। 'মাসুদ ভাই. এই দুজন পাঁচিল টপকে পালাচ্ছিল, পায়ে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি।'

'বেশ করেছ,' বলল রানা।

পাঁচ মিনিট পর। খানিকটা দূরে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুরু হলো। লোহার গেটটা খুলে যাচ্ছে। খুলে গেল পুরো। একে একে চারটে গাড়ি ঢুকল ভিতরে। ওগুলো থেকে নামল ষোলোজন বিএসএস এজেন্ট প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। ঘিরে ফেলা হলো রানাদের।

'যাক, ধরতে পেরেছেন তা হলে,' বলল তরুণ বিএসএস এজেন্ট উইলিয়াম।

'কৃতিত্বটা ওর,' গিল্টি মিয়াকে দেখাল রানা। 'ভেতরে আছে জেমস বেকার। সে আর টাকারই নাটের গুরু। বাকি সবাই সহযোগী।'

পাঁচজন এজেন্ট দ্রুত পায়ে চলে গেল ওয়্যারহাউসের ভেতরে। একটু পর রানা এজেন্সির দুজন অপারেটর ওয়্যারহাউসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

গিল্টি মিয়াকে ইশারা করল রানা. শাহানাসহ এজেন্সির সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পা বাড়াল কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। ওর গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে। এটুকু হেঁটেই যেতে হবে ওদেরকে।

পা বাড়িয়েই হঠাৎ কেন যেন জন লেইটারের কথা মনে পড়ে গেল রানার। প্রবীণ এজেন্টের মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। ঠিক এই সময়ে প্রিয় মানুষটার কথা মনে পড়ে যাওয়া প্রাসঙ্গিকই, ভাবল রানা। আত্মা বলে আদৌ যদি কিছু থাকে, হয়তো এতদিনে তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি পেল।

পরদিন সকাল দশটা। বিএসএস হেডকোয়ার্টার। মার্ভিন লংফেলোর অফিস। আধঘণ্টা হলো বিএসএস চিফের সঙ্গে অ্যাসাইনমেন্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ করছে রানা। ঘরে আরও উপস্থিত আছে মিস্টার লংফেলোর প্রাইভেট সেক্রেটারি, রেকর্ড রাখার জন্য ব্যস্ত হাতে দু'জনের সমস্ত কথাবার্তা শর্টহ্যান্ডে টুকছে সে।

রানার প্রশ্নের জবাবে মিস্টার লংফেলো বললেন, 'বিল টাকার আর জেমস বেকার, ইতিমধ্যেই কোটি কোটি পাউন্ড হাতিয়ে নিয়েছে। দলে লোকসংখ্যা কম থাকায় একেকজনের ভাগে পড়েছে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা। ব্রিটিশ সরকারের

অনুরোধে তাদের সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিয করেছে সুইস সরকার। টাকার আর বেকারের পরিকল্পনা ছিল সদূরপ্রসারী, আস্তে আস্তে একটা শক্তিশালী মাফিয়া সংগঠন তৈরির পথে এগোচ্ছিল তারা। মাফিয়ার সঙ্গে তাদের গোপন সংগঠনের তফাৎ শুধু এইটুকু থাকত যে, তারা এবং তাদের সহযোগীরা সবসময়েই থাকত আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'কিন্তু বাইরে আর থাকতে পারল কই।'

'হ্যাঁ, মারা যে-কটা গেছে তো গেছেই, ধরা পড়েছে বিএসএস-এর পাঁচজন আর এমআই ফাইভের তিনজন,' খুশি খুশি গলায় আবার বললেন লংফেলো। হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। 'একটাও পালাতে পারেনি, সবক'টাকে ঝোলায় ভরেছি আমরা। থ্যাঙ্কস টু ইউ, মাই ডিয়ার সান।'

'বিল টাকার তো ট্রুথ সেরামের প্রভাবে তোতাপাখির মত বুলি আওড়াচ্ছে,' বলল রানা, 'কিন্তু জেমস বেকারের এখনও আপনারা মুখ খোলাতে পারেননি,' বলল রানা। 'কারণটা কী?'

'তোমার লাথি খেয়ে বদমাশটার সেক্রামের পাশের হাড় ভেঙে গেছে কয়েক জায়গায়। ডাক্তাররা কোনমতে তার দিয়ে জোড়া লাগিয়েছেন, তবে তাঁরা বলছেন হয়তো কোনও দিনই সোজা হয়ে বসতে পারবে না আর বেকার। ব্যথা এত বেশি যে দু'ঘণ্টা পর পর লোকাল অ্যানেসথেশিয়া দিতে হচ্ছে তাকে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন এই অবস্থার ওপর ট্রুথ সেরাম পড়লে হারামিটা মারা পড়তে পারে। আমরা সেটা চাই না, আমরা চাই ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে।' উপচে পড়া স্নেহ নিয়ে রানার দিকে তাকালেন মিস্টার লংফেলো। 'আবার একবার বাঁচালে তুমি আমাকে, রানা। তোমার কাজ তো শেষ, এবার কী করবে ভাবছ? চলে এসো না আমার বাড়িতে, ক'টা দিন বেড়িয়ে যাও। খুব খুশি হবো আমি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'আমিও খুব খুশি হতাম যেতে পারলে, কিন্তু আমাকে একটু গ্লাসগোতে যেতে হবে।'

অবাক হলেন লংফেলো। 'কেন? ওখানে আবার কী?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করব। ফ্রান্সের সেরা কয়েকটা পারফিউম আর ব্রিটেনের সেরা একটা মিঙ্ককোট উপহার নিয়ে যাব তার জন্যে। জানতে চাই, আমার বোনটা এখনও আমাকে মনে রেখেছে কি না।'

'লন্ডনে ফিরছ কবে? তিনদিন পর আমার বাড়িতে পার্টি। ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ সবাই আসবে। পার্টিতে তোমার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে জানিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। নিজ মুখে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দিতে চান।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ, সার। তবে আমার পক্ষে এই পার্টি অ্যাটেন্ড করা সম্ভব হবে না। আর মাত্র চারদিনের ছুটি আছে আমার। দুটো দিন গ্লাসগোতে কাটিয়ে সোজা বাংলাদেশ বিমানে উঠতে হবে আমাকে।' উঠে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। 'আসি তা হলে, মিস্টার লংফেলো। এক ঘণ্টা পরেই গ্লাসগোর প্লেন ছাড়বে।'

'গুডবাই, মাই সান,' দুই হাতে রানার হাতটা ধরলেন মার্ভিন লংফেলো, আন্তরিক কণ্ঠে বললেন 'অ্যান্ড গুড লাক। মে গড অলওয়েয বি উইদ ইউ।'

ধন্যবাদ জানিয়ে দৃঢ় পায়ে মিস্টার লংফেলোর অফিস থেকে বের হয়ে এলো রানা।

একটু ভয়ই লাগছে ওর: বোনটা ওকে মনে রেখেছে তো?

***

মাসুদ রানা

নাটের গুরু

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু জন লেইটার। মাত্র জবাই করা হয়েছে তাঁকে, এই সময় অকুস্থলে পৌঁছে বিপদে পড়ে গেল মাসুদ রানা। উদ্ভিন্নযৌবনা এক তরুণী বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলল।
একজন বিজ্ঞানীর খোঁজে গোটা ইউরোপ চষে ফেলছে রানা, পিছনে পড়ে থাকছে লাশ আর লাশ, অথচ একটা খুনেরও কিনারা করা যাচ্ছে না। নাটের গুরুরা কি তা হলে ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক (সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০